সম্পূর্ণ উপন্যাস

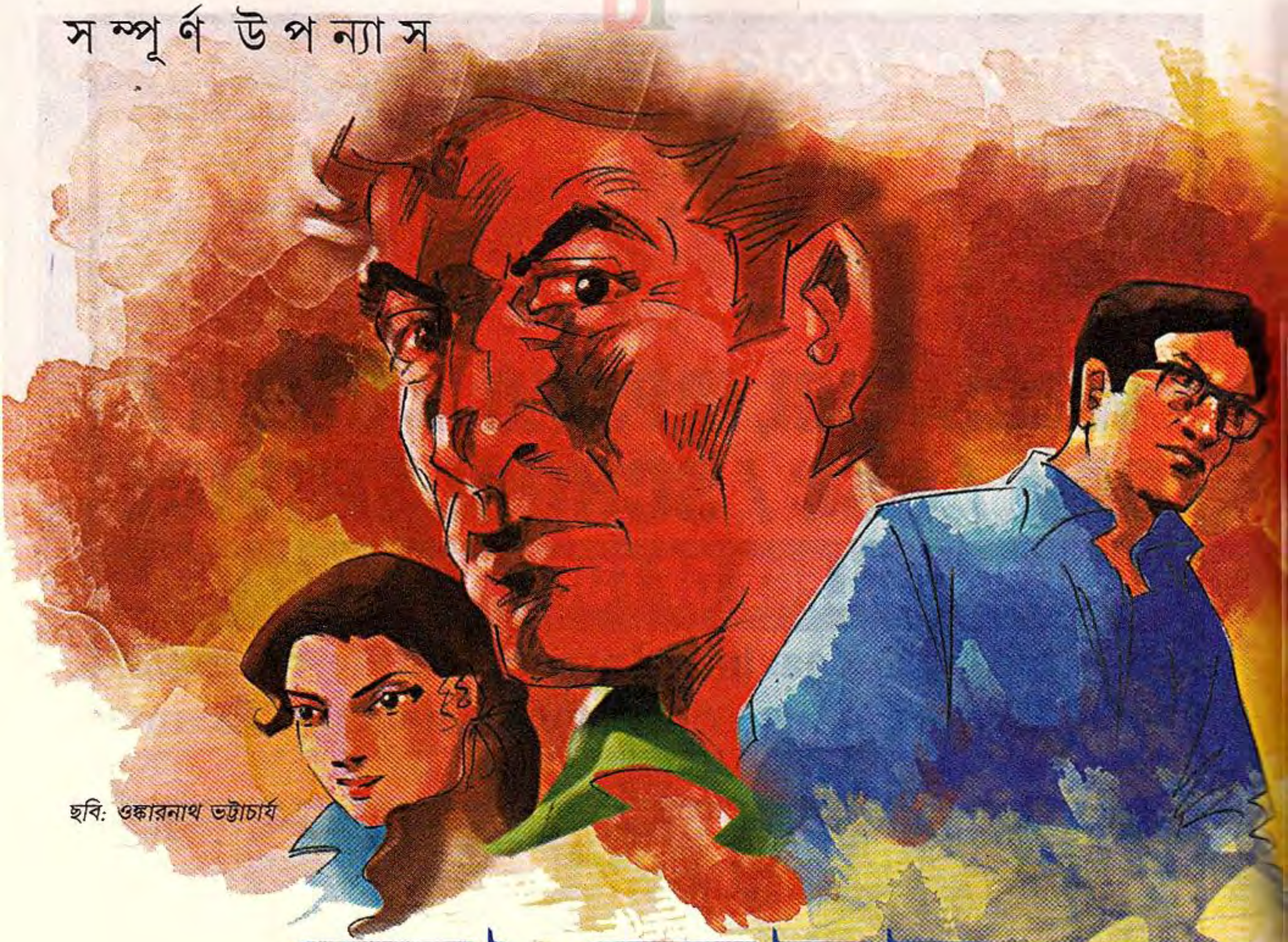

ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

চেনা চেহারায় অচেনা মানুষ

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

বলব না, বলব না করেও কথাটা তুলে ফেলল ঝিনুক, "একটা কাজের খবর, মানে কেস আছে।"

আজ রবিবার। বাড়িতে বাবার সঙ্গে দাবায় মগ্ন দীপকাকু। বোর্ড থেকে চোখ না তুলে বললেন, "শুনি কেসটা।"

ঝিনুক শুরু করে দেয় বলতে, "পরশু এলার বার্থডে পার্টি ছিল। ওর দূরসম্পর্কের এক

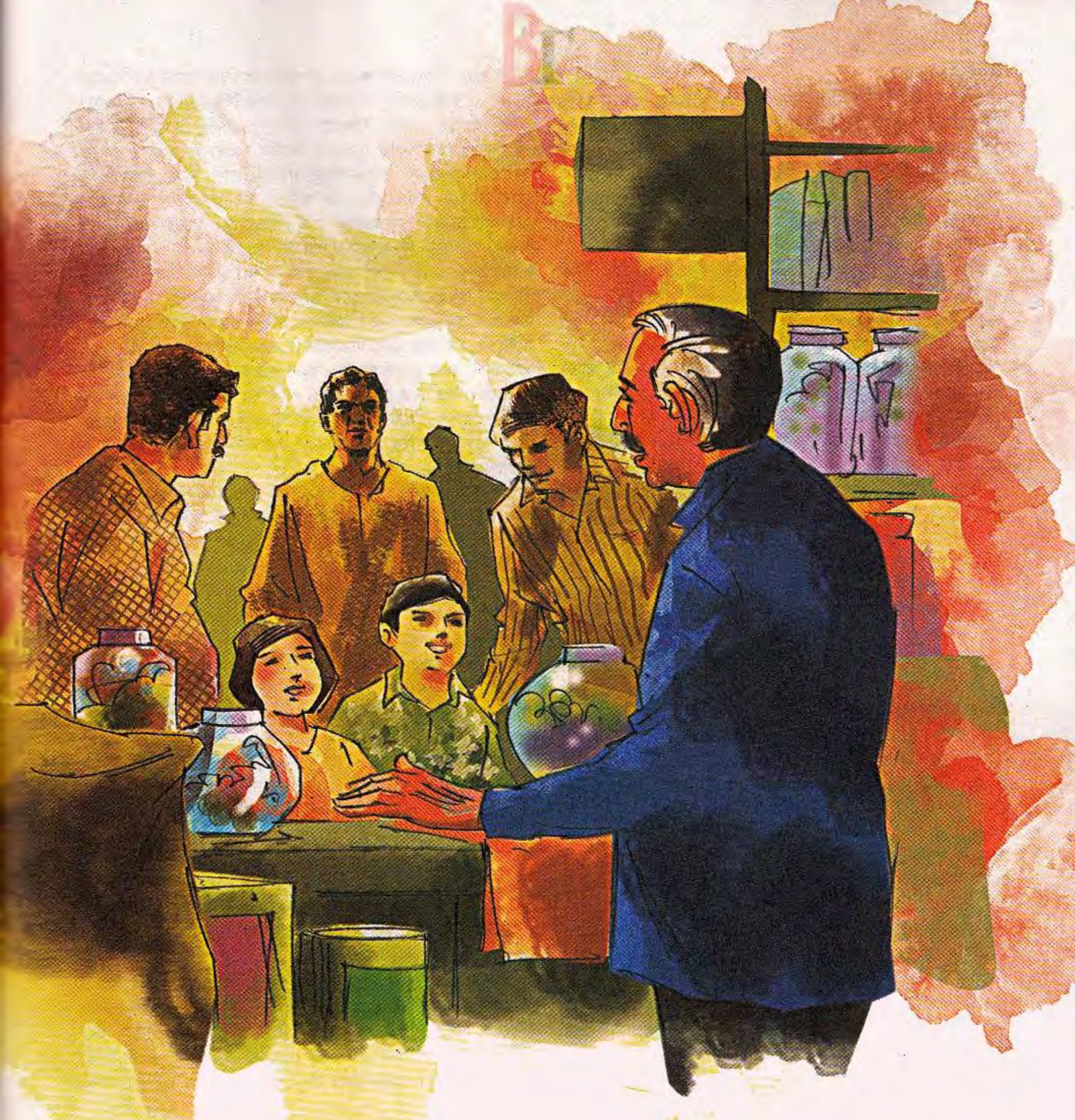

দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে আলাপ হল ওখানেই। নিউলি ম্যারেড।

"দিদি-জামাইবাবু বেহালায় থাকেন। সমস্যাটা হচ্ছে, মাসখানেক হল ওদের এলাকায় মণিময়দা, মানে জামাইবাবুর মতো দেখতে একজনকে দেখা যাচ্ছে। অনেকেই তাকে মণিময়দা বলে ভুল করছে।

"পাড়ার ইলেকট্রিশিয়ান যন্ত্রপাতি নিয়ে বাড়িতে হাজির। বলছে, মণিময়দা একটু আগে নাকি বলে গেল, ফ্রিজ চলছে না। এক্ষুনি যেন গিয়ে সারিয়ে দেয়। ফ্রিজে প্রচুর স্টক। সন্ধেবেলা বাড়িতে লোক আসবে। অথচ প্রকৃত ঘটনা হল, মণিময়দা আগের রাতে অফিস টুরে স্টেশন লিভ করেছেন। সন্ধেবেলা বাড়িতে কোনও গেস্ট আসারও কথা নেই। তারপর যেমন, বাজারের মাছওলা মণিময়দাকে বলছে, 'বাবু, কাল চিংড়িগুলো টাটকা ছিল তো?' আগের দিন বাজারেই যাননি এলার জামাইবাবু। তা ছাড়া রাস্তাঘাটে হামেশাই লোকজন বলছে, 'কী হল, কাল অত করে ডাকলাম, সাড়াই দিলেন না।'"

"ধুর, এটা কোনও কেসই না," তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন বাবা। বোর্ডে নিজের দান দিয়ে ফের বলতে থাকেন, "আমার সঙ্গে এরকম অনেকবার হয়েছে। অনেকেরই হয়।"

দীপকাকু ঝিনুকের উদ্দেশে বললেন, "ভদ্রলোক ওপাড়ায় কতদিন ধরে আছেন?"

"জিজ্ঞেস করিনি।"

"চাকরি করেন কোথায়?"

দীপকাকুর এই প্রশ্নে নিরুত্তর থাকে ঝিনুক। বোর্ডে একটা চাল দিয়ে দীপকাকু বললেন, "কেসটা যখন শুনছ, সব কিছু ভাল করে

জেনে নেবে না!"

বাবা বলে ওঠেন, "কী ব্যাপার বলো তো দীপঙ্কর, এরকম একটা কমন ঘটনাকে তুমি এত সিরিয়াসলি নিচ্ছ! এই তো দিন দশেকও হয়নি আমার সঙ্গে আবার একই ব্যাপার ঘটেছে। অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, পিঠে একটা চাপড়, 'কী রে ঘোষ, এপাড়ায়!' টাইটেল ভুল বলছে দেখেই বুঝেছি লোকটা গুলিয়েছে। ঘুরে তাকিয়ে ভুলটা ভাঙাতে যাব, লোকটা বলে কিনা, 'কী হল রে, একেবারে চিনতেই পারছিস না মনে হচ্ছে!'"

আর একটু হলেই হেসে ফেলছিল ঝিনুক, কোনওক্রমে গিলে নেয়।

মা জলখাবারের ট্রে নিয়ে ঢুকলেন ঘরে। দীপকাকু বললেন, "এই তো এসে গেল কলকাতার শ্রেষ্ঠ ব্রেকফাস্ট।"

দীপকাকুর প্রশংসা মা গায়ে মাখলেন না। নিয়মিত এই স্তুতির কারণ মায়ের অজানা নয়। খামোকা অনিশ্চয়তায় ভোগেন দীপকাকু। নিজের ফ্যানকে কখনওই হতাশ করেন না মা। নতুন-নতুন পদ রাঁধেন।

মা বলে ওঠেন, "দাঁড়াও, তোমাদের জন্য একটা সুইট ডিশও আছে। নিয়ে আসি।"

দীপকাকু মন দিয়ে খেতে-খেতে বাবাকে বললেন, "রজতদা, আপনার সঙ্গে ঘটনাগুলো ঘটেছে বিভিন্ন জায়গায়। মণিময়ের ডুপ্লিকেটকে দেখা যাচ্ছে শুধু পাড়াতেই এবং একমাস ধরে। এইটাই কেসটার ম্যাগনেট পয়েন্ট।"

বাবা, ঝিনুকের খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চোখে বিস্ময়। অতি সাধারণ কয়েকটা তথ্যের মধ্যে দীপকাকু গুরুত্বপূর্ণ অংশটা ঠিক বের করে ফেলেছেন!

দীপকাকু তাকালেন। বললেন, "ফোন করে দাও ওদের। ঠিকানা নিও বাড়ির। ওদের সুবিধেমতো সময়ে গিয়ে কেসটা ডিটেলে শুনব। তারপর ডিসিশন নেব কাজটা করব কিনা।"

মণিময়দাদের ফোন নম্বর নেয়নি ঝিনুক। দরকার পড়লে এলাকে ফোন করবে ঠিক করেছিল। ফোনের জন্য সোফা ছেড়ে উঠতে যায় ঝিনুক।

॥ ২ ॥

কাল এলার থেকে ফোন নম্বর নিয়ে মণিময়দার মোবাইলে কল করেছিল ঝিনুক। ফোন পেয়ে উনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলেছিলেন, "আজ রাতে আমিই তোমাকে ফোন করতাম। নম্বর নিতাম এলার থেকে।"

ঝিনুক বলেছিল, "কেন, আবার ডবলকে দেখা গিয়েছে নাকি?"

"দেখা তো গিয়েছেই, এবার একটা বাজে ঘটনা ঘটেছে। সরাসরি ক্ষতির মুখে পড়েছি।"

"কীরকম?"

মণিময়দা যা জানালেন, পাড়ার কনফেকশনারি কাম গ্রোসারিশপে মণিময়দার ডুপ্লিকেট চারশো টাকার উপর জিনিস কেনে। তারপর পার্স আনতে ভুলে যাওয়ার ভান করে। দোকানদার লোকটিকে মণিময়দা ভেবে বলে, 'আরে, কী আছে, আপনি পরে দিয়ে যাবেন।' ঘটনাচক্রে খানিক পরে সুনেত্রাদি ওই দোকানে ঢোকেন কিছু জিনিসপত্র কিনতে। দোকানমালিক বোঝে উলটো। বলে, 'এখনই টাকা পাঠানোর কী দরকার ছিল! কাল একসময় দিতেন।' কথা খানিকটা এগোতে সুনেত্রাদি বুঝলেন দোকানদারের বক্তব্য। বেশ খটকা লেগেছিল। সময় অনুযায়ী মণিময়দার তখন অফিসে থাকার কথা। বাড়ি ফিরতে রাত আট'টা-ন'টা। সুনেত্রাদিও বাড়ি ঢোকেননি। কাছেই একটা স্কুলে পড়ান। "তা হলে কি মণিময়দা আগেই ফিরে এলেন?" প্রশ্নটা মাথায় আসাতে সুনেত্রাদি মণিময়দাকে ফোন করেন। মণিময়দা জানান, তিনি অফিসে আছেন। সেই মুহূর্তে সুনেত্রাদি মণিময়দাকে ঘটনার কথা জানাননি। যে টাকার কথা দোকানদার উল্লেখ করছে, সেটাও মেটাননি। বলেছেন, "মণিময় এসে দিয়ে যাবে।" রাতে মণিময়দা ফিরলে দু'জনে আলোচনা করে বুঝতে পারেন, ঘটনা গুরুতর আকার নিতে চলেছে। উপযুক্ত কারও হেল্প নিতেই হবে। পুলিশের কাছে যাওয়া যাবে না, এখনও ব্যাপারটা অপরাধের পর্যায়ে পৌঁছয়নি। তারপরই ওঁরা সিদ্ধান্ত নেন, ঝিনুককে ফোন করে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর দীপঙ্কর বাগচীর শরণাপন্ন হবেন।

সমস্ত কিছু শুনে ঝিনুক অ্যাপয়েন্টমেন্টের টাইম নিজে ঠিক করে, দিনে যে যার কাজে ব্যস্ত থাকে, সন্ধের দিকেই ভাল। মণিময়দাকে বলেছিল, "আমরা যদি কাল সন্ধে ছ'টায় আপনাদের বাড়ি যাই, কোনও অসুবিধে আছে?"

"কোনও প্রবলেম নেই। আমি কাল তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসব।"

সুনেত্রা ততক্ষণে স্কুল থেকে ফিরেই আসেন। বলার পর মণিময়দা ওঁদের ঠিকানা বলেছিলেন। লিখে নিয়েছিল ঝিনুক। বাড়ির ফোন থেকে কথা বলছিল ঝিনুক। ল্যান্ডসেট যেহেতু বসার ঘরে, বাবা, দীপকাকু এক প্রান্তের কথা শুনে ঘটনার অনেকটাই আন্দাজ করতে পারলেন। বাকিটুকু ঝিনুককে প্রশ্ন করে জেনে নিলেন দীপকাকু। তারপর বাবাকে বললেন, "কী রজতদা, এবার মানবেন তো কেসটা কমন নয়?"

আগের দিনের কথা মতো দীপকাকু বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ঝিনুককে নিতে এসেছিলেন বাড়িতে। চাও খেলেন না। বাইকে ঝিনুককে চাপিয়ে কুদঘাট থেকে বেহালার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন।

পাঁচিলঘেরা ছোট একটা মাঠের কাছে এসে পড়েছে ঝিনুকরা। এটাই মনে হচ্ছে সেই পার্ক। ঠিকানা বোঝানোর সময় বলেছিলেন মণিময়দা, "ঢেঁকি, দোলনা, স্লিপ সব আছে।" পার্কে বাচ্চাদের তেমন দেখা যাচ্ছে না। সন্ধে নেমে এসেছে। বড়রা আছে। পার্কটাকে একটা রাউন্ড মেরে দীপকাকু বাইক দাঁড় করালেন হলুদ দোতলা বাড়ির সামনে।

আধঘণ্টা হয়ে গেল ঝিনুকরা বসে আছে মণিময়দাদের ড্রয়িংরুমে। কেস নিয়ে আলোচনা চলছে। বেশিরভাগ কথা সুনেত্রাদি বলছেন। মণিময়দা স্থির হয়ে বসতে পারছেন না। ঘনঘন ফোন আসছে ওঁর মোবাইলে। অধিকাংশই অফিসের কল। বারবার উঠে যেতে হচ্ছে আলোচনা ছেড়ে। ভিতর ঘরে গিয়ে ল্যাপটপ খুলে ডেটা দিচ্ছেন

ড: সুবোধ চৌধুরী কৃত
নীলনদের দেশ : মিশর ₹ ৫০
গল্প-রসিক বিবেকানন্দ ₹ ৪৫
ড: ভূতনাথ চৌধুরী কৃত
সল্টলেকের ভূত ₹ ৫০
কালীপদ মণ্ডল কৃত
বরণীয় ব্যক্তির স্মরণীয় শৈশব ₹ ৪০
দীননাথ সেন কৃত
বিশ্বের সেরা গল্প ₹ ৫০
ড: সত্রাজিৎ গোস্বামী কৃত
তাতার জীবন ₹ ৪০
বসুমিত্র মজুমদার কৃত
রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ₹ ৮০
চেনা গানের গীতবিতান ₹ ২৫০
আত্মপরিচয়-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ₹ ১৫০
উৎপল সেনগুপ্ত সম্পাদিত
যুদ্ধকালীন সাহিত্য সংগ্রহ-১৯৪২ ₹ ২৫০
যোগাচার্য্য ডা: শঙ্কর দাস কৃত
প্রাণায়ামে রোগ আরোগ্য ও জীবনশৈলী ₹ ১৫০
ড: রবীন্দ্রনাথ পাত্র কৃত
চার্লস ডারউইন ₹ ৬০
কালিদাস ভদ্র সম্পাদিত
অদ্ভুত সব ভূত ₹ ৮০
রূপকথার অরূপরতন ₹ ৮০
সন্দেহী গোয়েন্দা ₹ ৮০
শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প ₹ ৮০
সেরা লেখকদের সেরা প্রেমের গল্প ₹ ১২০
কল্পবিজ্ঞানের সেরা গল্প ₹ ৮০
জয়দুর্গা লাইব্রেরী ৮এ, কলেজ রো, কোলকাতা-৯

অফিসকে। একবার চা-ও করে নিয়ে এলেন ঝিনুকদের জন্য।

দীপকাকু এখনও পর্যন্ত যা-যা জানতে চেয়েছেন এঁদের কাছে, তার সঙ্গে কেসটার কতটা কী সম্পর্ক, ঝিনুক বোঝেনি। প্রশ্নের সূত্রেই জানা গেল, মণিময়দা বা সুনেত্রাদি কেউই লোকটাকে চাক্ষুষ করেননি।

নানা প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য মোটামুটি উঠে এল এইরকম, সুনেত্রাদি বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। বাবা ইস্টার্ন রেলওয়ের পদস্থ অফিসার। মা হোমমেকার। সুনেত্রাদির বিয়ের আগের বাড়ি সিঁথির মণ্ডলপাড়ায়। নিজেদের বাড়ি। মণিময়দার ঠাকুরদার করা বাড়ি সালকিয়ায় ক্ষেত্র মিত্র লেনে। সেখানে তাঁদের যৌথ পরিবার। বাবা, কাকা, জ্যাঠা এবং তাঁদের ছেলেমেয়েরা সব একসঙ্গে থাকে। মণিময়দারা তিন ভাই, এক বোন। মণিময়দা মেজো সন্তান। সব ভাইবোনের বিয়ে-থা হয়ে গিয়েছে। মণিময়দার বাবার ছাপাখানা ছিল, লেটার প্রেস। কিছু বছর সিল্ক স্ক্রিনের ব্যবসা করেছিলেন, এখন উঠে গিয়েছে। ছেলেদের রোজগারে সংসার চলে। বেহালার এই বাড়িটা ভাড়ার। এখানে চার বছর আছেন মণিময়দা। ওঁদের বিয়ে হয়েছে চোদ্দো মাস হল। এই বাড়িতে একসময় মণিময়দার কাকা ভাড়া থাকতেন। কাছেই ছিল ওঁর অফিস। রিটায়ারমেন্টের পর কাকা ফিরে যান সালকিয়ার বাড়ি। মণিময়দা এখানে চলে আসেন। ভাড়া খুবই কম। এখানে চলে আসার ফলে সবচেয়ে সুবিধে হয়েছে সুনেত্রাদির। ওঁর স্কুলটা পনেরো মিনিটের হাঁটা পথ। মণিময়দা একটা মাল্টিন্যাশনাল ইলেকট্রনিক কোম্পানির সেল্‌স প্রোমোশনে আছেন। হামেশাই টুর করতে হয়। মণিময়দার আদিবাড়ি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলায়। পূর্বপুরুষদের পেশা ছিল মূলত যজমানি, মানে পুরোহিতগিরি। ওঁরা মুখোপাধ্যায়। সুনেত্রাদির পদবি ছিল 'কর'। রাধিকাপুরে আদিবাড়ি। বংশে লেখাপড়ার খুব চল। পূর্বপুরুষদের বেশ ক'জন ডাক্তার, ব্যারিস্টার।

এই সব তথ্য লিখতে-লিখতে ঝিনুক আসল কেসটা প্রায় ভুলতে বসেছিল।

খানিক আগে পাঁচ নম্বর ফোনটা এসেছিল মণিময়দার মোবাইলে। কথা সেরে সোফায় এসে বসলেন। ফোনসেট পকেটে রেখে ক্লান্ত গলায় দীপকাকুকে বললেন, "তারপর কী মনে হচ্ছে আপনার?"

"আমার মনে হওয়ার খুব একটা কিছু নেই। আপনিই বলবেন, আপনার মতো দেখতে একটা লোক এপাড়াতে থাকলে কী-কী ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন আপনি?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

একটু হতাশ গোছের শ্বাস ছেড়ে মণিময়দা বললেন, "ক্ষতি তো অলরেডি শুরু হয়ে গিয়েছে। দোকানে জিনিস কিনছে সে, পেমেন্ট করতে হবে আমাকে।"

"এই সমস্যাটা আপনি সহজেই বন্ধ করতে পারবেন। পাড়ার বাছা-বাছা কয়েকটা দোকান থেকেই আপনি কেনাকাটা করেন, মাছ, সবজির বাজারেও সিলেকটিভ কয়েকজনের কাছে জিনিস কেনেন, সব মিলিয়ে গোটা দশ-বারোজনকে গিয়ে আপনার ডুপ্লিকেটের কথা বলতে হবে। তারা যেন আপনাকেও ধারে জিনিস না দেয়।"

"ওরকম ছোটখাটো ক্ষতি আমি সামলে নিতে পারব। আমার চিন্তা অফিস নিয়ে।"

"কীরকম?"

মণিময়দা বলতে থাকেন, "যখন ডিলার্‌স মিট করি, কেউ-কেউ হাতে-হাতে পেমেন্ট দিয়ে দেয়। সেটা চেকে, কখনও বা ক্যাশেও। আমার বদলে আমার ডুপ্লিকেট যদি ক্যাশটা হাতিয়ে নেয়! ডিলারদের কাছে পার্সোনাল লোনও নিতে পারে। আমাদের ডিলাররা যথেষ্ট পয়সাওলা এবং আমার সঙ্গে যেরকম রিলেশন, দু'-তিন লাখ অনস্পট দিয়ে দেবে। কোনও পেপার এগ্রিমেন্ট করাবে না। শুধু মুখের কথায়, বিশ্বাসের উপর।"

মণিময়দার কথা শেষ হতে দীপকাকু একটু চুপ থেকে কী যেন ভেবে নিলেন। তারপর জানতে চাইলেন, "ডিলাররা যখন প্রোডাক্টের কস্ট ক্যাশে পেমেন্ট করে, অ্যামাউন্ট কতটা বেশি হতে পারে?"

"এক-দেড় লাখ পর্যন্ত যেতে পারে। সেই ক্ষতি যদি আমাকে মেটাতে হয়, সমস্যায় পড়ে যাব। অতটা সামর্থ্য আমার নেই। তা ছাড়া, এসব গোলমাল কোম্পানির কানে গেলে, চাকরি চলে যাওয়াও আশ্চর্যের কিছু না।"

মণিময়দা থামতেই দীপকাকু বলে ওঠেন, "এবার একটা অত্যন্ত সাধারণ, প্রত্যাশিত প্রশ্ন করব। আপনার ঘটনা শোনার পর যে কেউ এটা করবে।"

"ওঁর কোনও যমজ ভাই আছে কিনা, এটাই তো জানতে চাইছেন আপনি?" মৃদু হাসিসহ বললেন সুনেত্রাদি।

দীপকাকু হাসলেন না। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। মণিময়দা বললেন, "না, আমার কোনও যমজ ভাই নেই। তবে নিজের দাদা, ভাই, এমনকী, জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো ভাই-দাদারা আমরা সব একই ছাঁচের। অবশ্য যমজের মতো অত সিমিলারিটি নেই। দূর থেকে একঝলক দেখলে গুলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। একটু খুঁটিয়ে বা কাছ থেকে দেখলে ভুল হবে না।"

"ভাই-দাদাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে আপনাকে বিপদে ফেলতে চায়, ক্ষতি চায় আপনার?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

মণিময়দা বললেন, "সেরকম নির্দিষ্ট করে কারও নাম বলতে পারব না। তবে এটাও একটা পয়েন্ট। সালকিয়ার বাড়িতে যে ভাই-দাদারা থাকে, তারা কেউই আমাকে খুব একটা পছন্দের চোখে দ্যাখে না।"

"কারণ?" কপালে ভাঁজ ফেলে জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকু।

"এককথায় জেলাসি বলতে পারেন। হিংসে করে আমাকে," একটু থামলেন মণিময়দা। ফের বলতে থাকলেন, "আমরা দু'জনে চাকরি করি, আলাদা থাকি। ওদের ধারণা, আমরা খুব আরামের জীবন কাটাই। আমার তুলনায় ওরা আর্থিক দিক থেকে একটু দুর্বল। আমার এক জ্যাঠতুতো দাদা চাকরিসূত্রে মুম্বইয়ে থাকে। তার অবস্থা আমার চেয়েও ভাল। তাকে নিয়ে ভাইদের কোনও রাগ নেই। কারণ, চাকরির জন্যই সে আলাদা থাকতে বাধ্য। কিন্তু আমি, সুনেত্রা সালকিয়ার বাড়িতে থেকেও নিজেদের চাকরি করতে পারতাম। ওরা আমাদের স্বার্থপর মনে করে।"

দীপকাকু বললেন, "কিন্তু আপনার কাকা নিজেই তো আপনাকে এখানে থাকতে দিয়েছেন।"

"হ্যাঁ, কাকা, বাবা, জ্যাঠার তো আমার উপর কোনও রাগ নেই। তাঁরা আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। কাকার দুই ছেলের একজনকে দিতে পারতেন বাড়িটা। অনেকদিন ধরে ছিলেন, ভাড়া বেড়েছে নামমাত্র। আমার খুড়তুতো দুই ভাই ছোটখাটো ব্যবসা করে সালকিয়া অঞ্চলে। এখানে থাকলে তাদের কাজের অসুবিধে হত।"

"আর এমন কে আছেন, যিনি মনের মধ্যে আপনার প্রতি শত্রুতা পোষণ করেন?"

"দেখুন, কম-বেশি শত্রু তো সকলেরই থাকে। বন্ধুমহলে, অফিসে। আপনারও কি নেই? আজ পর্যন্ত যত অপরাধীকে ধরেছেন, তারা সকলেই আপনাকে শত্রু মনে করে।"

মণিময়দা কথার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। তবু বিষয়টা এভাবে কখনও ভাবেনি ঝিনুক। সত্যিই তো যত দিন যাচ্ছে, দীপকাকুর শত্রুর লিস্ট লম্বা হচ্ছে। একটু সাবধানে চলাফেরা করা উচিত দীপকাকুর, একই সঙ্গে ঝিনুকেরও। নিজের শত্রু নিয়ে মাথাব্যথা নেই দীপকাকুর। প্রশ্নটাকে সুনির্দিষ্ট করে নিয়ে বললেন, "আপনার শত্রুদের মধ্যে কে সুযোগ পেলেই ক্ষতি করতে পারে বলে মনে হয়? আপনার প্রতি যার তীব্র রাগ আছে, ক্ষতি করার সামর্থ্যও থাকতে হবে?"

মণিময়দা উত্তর দিতে সময় নিচ্ছেন।

সুনেত্রাদিও ভুরু কুঁচকে একটু ভেবে নিলেন। মণিময়দার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পল্লব ঘোষের কেসটা বলো।"

"ও, হ্যাঁ। পল্লবের আমার প্রতি রাগ থাকা স্বাভাবিক। শোধ নেওয়ার একটা চেষ্টা ও করতেই পারে।"

"কী হয়েছিল ওঁর সঙ্গে?"

মণিময়দা বললেন, "পল্লব আমার কলিগ ছিল। আমার কমপ্লেনে ওর চাকরিটা যায়। কোম্পানিকে রেগুলার বেসিসে ঠকিয়ে যাচ্ছিল। সিম্পলি চুরি করছিল বলা যায়। আমি ধরে ফেলেছিলাম। শুধরে

যাওয়ার সময় দিয়েছিলাম ওকে, শোধরায়নি। উলটে চুরির টাকার ভাগ দিতে চেয়েছিল আমাকে, আমি বাধ্য হয়ে কোম্পানিকে জানাই।"

"কীভাবে চুরি?"

"আমি যেমন সেল্‌স প্রোমোশনে আছি, পল্লব ছিল সেল্‌স অ্যান্ড সার্ভিসে। আমাদের প্রোডাক্টে কোনও ফল্ট দেখা দিলে পল্লব টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিত। চুরি করার সুযোগটা পেয়েছিল ওখান থেকেই। আমাদের মাইক্রোওয়েভ আভেনের সবচেয়ে জরুরি পার্টস আমদানি করা হয় বিদেশ থেকে। আকারে ছোট এবং বেশ কস্টলি। ফল্টি সেট সারানোর সময় পল্লব দামি পার্টসটা খুলে নিয়ে লোকাল পার্টস লাগিয়ে দিত। রেগুলার প্র্যাকটিসের মধ্যে এনে ফেলেছিল ব্যাপারটা।"

"আপনি কী করে ধরলেন?"

"দেখুন, আমাদের কোম্পানি বেশ বড়। একটা রেপুটেশন আছে। ওয়ারান্টি পিরিয়ডের মধ্যে প্রোডাক্ট দু'বার খারাপ হলে আমরা সেট রিপ্লেস করে দিই। খারাপ সেট চলে যায় স্ক্র্যাপে। কেউ ফিরেও দেখে না ওতে কী গন্ডগোল আছে। যন্ত্রটা ভেঙে ফেলা হয়," কথা থামাতে বাধ্য হন মণিময়দা। আবার রিং হচ্ছে ওঁর মোবাইল সেটে। "এক্সকিউজ মি," বলে ফোন কানে লাগিয়ে উঠে যান। দীপকাকু সুনেত্রাদিকে বললেন, "এত ফোন এলে নিশ্চয়ই আপনার রাগ হয়? নিজেদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কথা বলতে পারেন না!"

হাল ছাড়া গলায় সুনেত্রাদি বললেন, "সে আর কী করা যাবে বলুন, ওর প্রাইভেট কোম্পানি। ছুটির পরও ছুটি নেই। বাড়িতে অফিস ওরিয়েন্টেড ফোন আসতেই থাকে। মানিয়ে নিতে হয়েছে। তবে আজ যেন বড্ড বেশি আসছে।"

ফিরে এলেন মণিময়দা। বললেন, "হ্যাঁ, যা বলছিলাম, কিছুদিন ধরে লক্ষ করছিলাম ওয়ারান্টি পিরিয়ডের মধ্যে আমাদের মাইক্রোওয়েভ আভেনের ডাবল ফল্টের সংখ্যা বাড়ছে। তখন তো বুঝিনি লোভ বাড়ছে পল্লবের। ওকে জিজ্ঞেস করলে বলত, আভেনের ব্যাচটা খারাপ এসেছে। নর্থ-ইস্ট রিজিয়নে পল্লব একমাত্র সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার। ওকে চ্যালেঞ্জ করার মতো এখানে কেউ নেই। হেডঅফিস মুম্বইতে। সেখান থেকে ইঞ্জিনিয়ার ডেকে পাঠানোর আগে আমিই একটা ডাবলফল্টি আভেন লুকিয়ে খুলে ফেললাম। ছোট থেকেই আমার যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়ার ঝোঁক। পল্লবের মতো কোনও ডিপ্লোমা করা হয়নি। ধরে ফেললাম গলদ।"

"তার মানে, ধরা সে পড়তই। আপনার টেকনিক্যাল ব্যাপারে ন্যাক থাকার কারণে আগে পড়ল। ইঞ্জিনিয়ার এলে পরে পড়ত।"

দীপকাকুর মন্তব্য সমর্থন করলেন না মণিময়দা। মাথা নেড়ে বললেন, "ইঞ্জিনিয়ার এলে ধরা পড়ত না। আসলে পরপর ডাবলফল্টের ঘটনা দেখে আমার মনে হয়েছিল, কোনও একটা ষড়যন্ত্র থাকলেও থাকতে পারে। হেডঅফিস থেকে ইঞ্জিনিয়ার ডেকে পাঠালে ষড়যন্ত্রকারী জানতে পারবে। এমন দু'-চারটে ডাবলফল্ট সেট ইঞ্জিনিয়ারের জন্য সাজিয়ে রাখবে, যেগুলো খুলে মূল সমস্যায় পৌঁছনো যাবে না। সেই জন্যই আমায় কাজটা গোপনে করতে হয়েছিল।"

"ওরে বাবা, আপনি তো প্রায় আমাদের ভাত মারতে পারেন দেখছি!" মজার সুরে প্রশংসা করলেন দীপকাকু। ঝিনুকও অবাক হয়েছে মণিময়দার বুদ্ধির বহর দেখে। গর্বের হাসিসহ সুনেত্রাদি তাকিয়ে রয়েছেন হাজব্যান্ডের দিকে। সলজ্জ হেসে মণিময়দা বললেন, "আসলে সব মানুষের মধ্যেই কম-বেশি গোয়েন্দার গুণাগুণ থাকে। প্রকৃত গোয়েন্দা হন তাঁরাই, যে-কোনও ফিল্ডে যাঁরা নিজের ক্ষমতা প্রমাণ করেন। নিজের কাজের জায়গা বলে ব্যাপারটা মগজে ধরতে পেরেছি আমি।"

মণিময়দার বিনয়ী সহবতে খুশি হয় ঝিনুক। দীপকাকুকে প্রাপ্য মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করলেন না। মণিময়দা এবার সুর পালটে বললেন, "আচ্ছা, পল্লবের কথা আমরা ভাবছি বটে, কিন্তু ওর সঙ্গে তো আমার চেহারার কোনও মিলই নেই।"

"আপনার মতো একজনকে রিক্রুট করতে পারেন।"

"রিক্রুট!" বিস্ময়ের সঙ্গে দীপকাকুর কথাটা রিপিট করলেন মণিময়দা। তারপর শূন্যে দৃষ্টি রেখে যেন নিজেকেই বলতে লাগলেন, "আমার ক্ষতি করার জন্য এত আয়োজন করবে! টাকা খরচের ব্যাপারও তো আছে।"

"ওঁর বাড়ি কোথায়? পল্লব এখন কী করেন, কিছু জানেন?" জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকু।

মণিময়দা বললেন, "এখন কী করে জানি না। সেই ঘটনার পর থেকে আর কখনও দেখা হয়নি। বাড়ি বউবাজারের দিকে। একবারই গিয়েছিলাম ওর বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে। রাস্তার নাম এখন আর মনে নেই।"

সোফায় ঠেসান দেওয়া পিঠ তুললেন দীপকাকু। নড়েচড়ে বসলেন। মনে হচ্ছে এবার উঠবেন। মণিময়দাকে সম্ভবত শেষ প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, আপনার ডুপ্লিকেট আর্থিক ক্ষতি ছাড়া আরও বড় কোনও বিপদের মধ্যে কি আপনাকে ফেলতে পারে? সেরকম কোনও আশঙ্কার কথা কি মাথায় আসছে?"

উত্তর দিতে সময় নিলেন না মণিময়দা। বললেন, "করতে পারে অনেক কিছুই। আমার পরিচিত লোকজনের সঙ্গে অভব্য ব্যবহার করল, যার দায় নিতে হবে আমায়। অফিসে ঢুকে আমার পার্সোনাল পেপার্স হাতিয়ে নিতে পারে। মাথায় বদ মতলব থাকলে আমার সর্বনাশ করতে সময় লাগবে না। শুধু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে হাত দিতে পারবে না, সই মিলতে হবে। আমার এ টি এম কার্ডের কোডও তার জানার কথা নয়।"

"আপনার কম্পিউটারেও অ্যাকসেস নিতে পারবে না। পাসওয়ার্ড লাগবে," বললেন দীপকাকু।

মণিময়দা বললেন, "রাইট ইউ সে।"

দীপকাকু এবার সুনেত্রাদির দিকে তাকিয়ে বললেন, "ডুপ্লিকেটকে নিয়ে আপনার কী-কী সমস্যা হতে পারে?"

"আমার সমস্যা ভয়ংকর। মুখোমুখি হলে অনেক পার্সোনাল কথা বলে ফেলতে পারি। আমি এমনিতেই বেশি বকবক করি। তারপর ধরুন, লোকটা যদি বাড়ি ঢুকে আসে, আমার হাতে চা, জলখাবারও জুটে যাবে," কথা শেষ করার আগে ফিক করে হেসে ফেললেন সুনেত্রাদি।

ঝিনুকের অবাক লাগে, এত সিরিয়াস আলোচনার পরও সেন্স অফ হিউমার অটুট আছে সুনেত্রাদির। বোঝাই যাচ্ছে বেশ খোলামেলা মনের মানুষ।

সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন দীপকাকু। মণিময়দাকে বললেন, "চলুন। দোকানদারের কাছে একবার যাই। যে ডুপ্লিকেটকে দেখে আপনি বলে ভুল করেছিল।"

সুনেত্রাদি বললেন, "আমিও যাই, নাকি?"

দীপকাকু বললেন, "হ্যাঁ, আসুন না।"

মণিময়দার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডান দিকের রাস্তা ধরে মিনিট তিনেক হেঁটে গ্রোসারি কাম কনফেকশনারি দোকানটায় পৌঁছল ঝিনুকরা। ফ্ল্যাটবাড়ির গ্রাউন্ড ফ্লোরে দোকান। ভিড় তেমন নেই। দোকান থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়েছে ঝিনুকরা চারজন। জিনিস কিনে এক কাস্টমার সরে যেতেই মধ্যবয়সি দোকানদারের চোখ পড়ল মণিময়দার উপর, সামান্য চমকালেন যেন। পরমুহূর্তে দৃষ্টি গেল সুনেত্রাদির দিকে। তারপরই দোকানমালিকের মুখে আশ্চর্য বদল, কী ভীষণ কুণ্ঠা! অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বলে উঠলেন, "সরি দাদা, সরি। আমারই ভুল হয়েছে। মিছিমিছি সেদিন বউদিকে আপনার কথা বললাম।"

ঝিনুকরা দোকানের কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াল। দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "কী করে বুঝলেন ভুল হয়েছে?"

"এই তো কিছুক্ষণ হল লোকটা এসে বাকি রাখা টাকা পেমেন্ট করে গেল।"

দীপকাকু ছাড়া বাকি তিনজন বিস্ময়ের দৃষ্টিতে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন। দীপকাকু ফের দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলেন, "কতক্ষণ আগে এসেছিল লোকটা?"

"তা ধরুন, দশ-পনেরো মিনিট হবে মনে হয়," একটু থেমে দোকানদার বলে, "দাদার সঙ্গে মিল আছে ঠিকই, তবে একদম সেম টু সেম নয়। এরপর আর ভুল হবে না। সরি।"

"তফাত কী-কী আছে?" জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকু।

দোকানমালিক বলল, "চুলের স্টাইল আলাদা। দাদার তুলনায় চুল কম। গোঁফ দাদার চেয়ে মোটা। চশমা নেই। হাইটও বোধ হয় একটু শর্ট।"

দীপকাকু দোকানদারকে ফের প্রশ্ন করেন, "লোকটা কী পরে ছিল আজ? মানে ড্রেস।"

দরকারি জিনিস মনে পড়ার মতো দোকানদার বলে ওঠে, "ও হ্যাঁ। লোকটা আগের দিন পরেছিল প্যান্ট-শার্ট। বোধ হয় অফিসফেরত। আজ পাজামা-পাঞ্জাবি। আপনাকে তো পাজামা-পাঞ্জাবিতে কখনও দেখিনি। তাই আজ তফাত করতে প্রবলেম হয়নি কোনও।"

শেষের কথাগুলো মণিময়দার দিকে তাকিয়ে বলল দোকানমালিক। কাউন্টার থেকে পিছিয়ে এলেন দীপকাকু। দেখাদেখি বাকি তিনজনও সরে এলেন। কাউন্টারে দাঁড়াল নতুন কাস্টমার। দীপকাকুর মুখ অসম্ভব গম্ভীর।

মুখ তুললেন দীপকাকু। মণিময়দার দিকে আকুতির দৃষ্টি নিয়ে বললেন, "আপনি একদম পাজামা-পাঞ্জাবি পরেন না, না?"

"পরি। বিয়েবাড়ি বা সেরকম কোনও পার্টি থাকলে। সবই ডিজাইনার। ক্যাজুয়াল ওয়্যার হিসেবে ব্যবহার করি না।"

"তা হলে তো আর বিশেষ কোনও প্রবলেম রইল না। ড্রেসের ব্যাপারে ডুপ্লিকেটের চয়েস আলাদা। চেহারাতেও অল্পবিস্তর ফারাক আছে। কিছুদিন পাড়ার লোক গোলাবে, তারপর আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বাইকটা আছে মণিময়দাদের বাড়ির সামনে। কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর দীপকাকু বললেন, "লোকটাকে আবার যদি কোথাও দেখা যায়, আমাকে একবার জানাবেন।"

"নিশ্চয়ই," বললেন মণিময়দা।

বাইকের কাছে পৌঁছে গিয়েছে ঝিনুকরা। মণিময়দা কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, "আমার তো আপনাকে কিছু ফিজ দেওয়া উচিত। অনেকটা সময় দিলেন।"

"না-না, ও কিছু না। সুন্দর একটা আড্ডা তো হল," বলে বাইকে চেপে বসলেন দীপকাকু। ঝিনুক পিছনে গিয়ে বসে।

মণিময়দাদের হাত নেড়ে বাই করে ঝিনুকরা অনেকটাই এগিয়ে এসেছে। বাইকের পিছন থেকে ঝিনুক এবার বলে, "ফিজটা নিতেই পারতেন। সত্যিই তো অনেকটা টাইম নষ্ট হল।"

"সময় কোনওদিন নষ্ট হয় না। কিছু না-কিছু দেয়। সমৃদ্ধ হয় অভিজ্ঞতা। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, কেসটা এখানেই শেষ নয়। চলবে।"

॥ ৩ ॥

মাঝে প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টার গ্যাপ গেল।

আজ কলেজে ঢোকার পর নানান হইচইয়ের মধ্যে কেসটা প্রায় ভুলতেই বসেছিল ঝিনুক।

সন্ধের পরই দীপকাকুর ফোনটা এল ঝিনুকের মোবাইলে। জিজ্ঞেস করলেন, "বাড়িতে না বাইরে?"

"বাড়িতেই আছি।"

"পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছি। রেডি হও।"

"কোথায় যাচ্ছি আমরা?"

দীপকাকু বললেন, "বিডন স্ট্রিট।"

"কোনও নতুন কেস?"

ঝিনুকের প্রশ্ন শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে উঠেছিলেন দীপকাকু, "কেন, আমাদের আগের কেসটা কি সলভ হয়ে গিয়েছে?"

দীপকাকু বাড়িতে ঢোকার পর বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "বিডন স্ট্রিটে কী কাজে যাচ্ছ?"

"পল্লব ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে। ওখানেই বাড়ি," বলেছিলেন দীপকাকু।

ঝিনুক এবং বাবার অসুবিধে হয়নি পল্লববাবুকে মনে করতে। মণিময়দার তৎপরতায় লোকটি ধরা পড়ে। চুরির অপরাধে চাকরি যায় তার। বাবা জানতে চাইলেন, "ঠিক কী কারণে পল্লব ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে চাইছ, জানতে পারি কি?"

"এই কেসটার সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে আঁচ করতে গেলে মণিময়ের পরিচিত কিছু মানুষের সঙ্গে আমায় দেখা করতে হবে। যাদের মধ্যে অন্যতম এই পল্লব ঘোষ।"

বাবা বললেন, "লোকটা যদি অপরাধী হয়, তুমি কাজে নেমেছ জেনে সে তো সতর্ক হয়ে যাবে।"

"অপরাধ তো এখনও ঘটেইনি। অপরাধীকে চিহ্নিত করব কী করে!"

ঝিনুক জিজ্ঞেস করেছিল, "পল্লব ঘোষের বাড়ির অ্যাড্রেস পেলেন কীভাবে? মণিময়দা তো সঠিক ভাবে বলতে পারেননি। বউবাজার অঞ্চল বলে ছেড়ে দিলেন।"

"রঞ্জনকে দিয়ে ওদের অফিসে ফোন করিয়েছিলাম। আমি জানতে চাইলে একগাদা প্রশ্ন করত। অ্যাড্রেস গতকালই দিয়েছে। আজ খবর নিয়ে ডিটেলে জানিয়েছে লোকটা এখন কী করে, না করে। অফিস থেকেই বলেছে রাত আটটার পর পল্লব ঘোষকে বাড়িতে পাওয়া যাবে। সকালের দিকটায় ব্যস্ত থাকে।"

লালবাজারে চাকরি করা বন্ধু রঞ্জনকাকুকে প্রায় প্রতিটা কেসেই কাজে লাগে দীপকাকুর।

পল্লব ঘোষ এখন কী করেন, জানা হয়নি ঝিনুকের। মায়ের দেওয়া পকোড়া, চা শেষ করতে গিয়ে বাড়িতেই পৌনে আটটা বেজে গিয়েছিল। দীপকাকু তড়িঘড়ি ঝিনুককে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। বাইকে চেপে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের কাছে এসে পড়েছে ঝিনুকরা।

মেন রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকে ঢুকে পড়ল। উলটো দিক থেকে এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক হেঁটে আসছেন। কাছে পৌঁছতে দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "পল্লব ঘোষের বাড়িটা কোথায়? ইলেকট্রিক্যাল জিনিসপত্র সার্ভিস করেন।"

ভদ্রলোক আঙুল তুলে পুরনো একটা বাড়ির দরজা দেখালেন।

বাড়িটার বয়স দু'শোর উপর তো হবেই। চার ধাপ সিঁড়ি উঠে ডোরবেল টিপেছেন দীপকাকু। দরজার উপরে টিনের সাইনবোর্ড। নাম লেখা, 'ঘোষ ইলেকট্রিক্যাল সার্ভিস সেন্টার'। নীচে ঠিকানা।

দরজার ওপারে কাঠের খিল খোলার শব্দ। দেখা গেল একটা বছর চারেকের ছেলে। কিছু বলছে না, ঝিনুকদের দিকে তাকিয়ে আছে।

দীপকাকু বললেন, "পল্লববাবু বাড়ি আছেন?"

"দাঁড়ান," বলে ছেলেটি ছুট্টে ভিতরে গেল। ফেরত এল তাড়াতাড়ি। বলল, "আসুন।"

চৌকাঠ পেরোয় ঝিনুক-দীপকাকু। সরু প্যাসেজ, পলেস্তরা খসা দেওয়াল, কালচে মেঝে। বাচ্চাটিকে অনুসরণ করে ঝিনুকরা পৌঁছল নিচু দরজার কাছে। ছেলেটা 'বাবা' বলে ডেকে সরে গেল। বেসমেন্টে ঘর, ওয়ার্কশপ বলা উচিত। রিভলভিং চেয়ারে বসা ভদ্রলোক ঝিনুকদের দিকে ঘুরে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। পিছনের টেবিলে বিভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল গ্যাজেট। একটা মাইক্রোওয়েভ আভেনের সব ডালা খোলা। উপরে ঝুলছে আলোজ্বলা ল্যাম্পশেড। বোঝা যাচ্ছে ওটারই সারাই চলছিল।

"আপনিই তো পল্লব ঘোষ," বলে দীপকাকু সিঁড়ি ভেঙে নামলেন নীচে। ঝিনুকও নেমে এল।

ভদ্রলোকের কপালে ভাঁজ। বললেন, "হ্যাঁ। কী ব্যাপার?"

দীপকাকু নিজের কার্ড বের করে এগিয়ে দিলেন। পল্লববাবুর নাকের ডগায় চশমা, কার্ড পড়ে বিস্ময়ের গলায় বললেন, "ডিটেকটিভ!"

ঘরে প্লাস্টিকের একটা চেয়ার আর টুল আছে, দীপকাকু চেয়ারটা টেনে পল্লব ঘোষের মুখোমুখি বসলেন। ঝিনুক বসল টুলে। দীপকাকু বলতে লাগলেন, "আপনার পুরনো কোম্পানি আই এস

বি'র কলকাতার অফিসে একটা গরমিল ধরা পড়েছে। বড় ধরনের টাকাপয়সার কেলেঙ্কারি। এ ব্যাপারে এনকোয়ারির জন্য আপনাদের মুম্বইয়ের হেডঅফিস থেকে আমাদের এজেন্সিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।"

"তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? এক বছরের উপর হল চাকরি ছেড়ে দিয়েছি আমি," বিস্ময় এবং খানিকটা ঘাবড়ে যাওয়া গলায় বললেন পল্লববাবু। বয়সে মণিময়দার চেয়ে বড় বলেই মনে হচ্ছে। চেহারায় কেজো, কর্মঠ ভাব।

একটু সময় নিয়ে দীপকাকু অননুকরণীয় দৃঢ় ভঙ্গিতে বললেন, "চাকরি আপনি ছাড়েননি। বরখাস্ত হয়েছিলেন।"

মাথা নামিয়ে নিলেন পল্লববাবু। বললেন, "সব খবরই তো আপনার কাছে আছে দেখছি। তবে এখনকার গোলমালের মধ্যে আমাকে টেনে কী লাভ! অফিসের রাস্তায় পা রাখি না আমি। কারওর সঙ্গে যোগাযোগ নেই আমার। পুরনো কলিগরা কেউ খোঁজও নেয় না।"

"জানি। ঠিক সেই কারণেই আপনার কাছে আসা," বললেন দীপকাকু।

পল্লববাবুর ভ্রূজোড়া কাছাকাছি চলে এল। বললেন, "ঠিক বুঝলাম না।"

"বলছি বুঝিয়ে," বলে দীপকাকু শার্টের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে অফার করলেন পল্লববাবুকে। বিনয়ের সঙ্গে মাথা নেড়ে পল্লববাবু বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ। আগে খুব খেতাম। এখন একেবারে ছেড়ে দিয়েছি।"

সিগারেট ধরিয়ে দীপকাকু বলতে শুরু করলেন, "আপনি যেহেতু বেশ ক' বছর চাকরি করেছেন আই এস বি'তে। কোম্পানির অনেক খবর জানেন। আমাকে সেসব বললেও আপনার কোনও সমস্যা হবে না। কারণ, পুরনো কলিগ বা বসের মন জুগিয়ে চলার দায় আপনার নেই। যারা এখন চাকরিরত, তাদের কিন্তু আছে। তারা সব কথা সত্যি বলবে না।"

"রাইট। কিন্তু আপনাকে হেল্প করে আমার কী লাভ?"

"লাভ-ক্ষতির কথা পরে হবে। আপাতত একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনাকে জানাই। কোম্পানির এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে মণিময় মুখার্জির নাম জড়িয়ে পড়েছে।"

বেশ ভালমতোই চমকালেন পল্লববাবু। মুখ ফুটে বেরিয়ে এল, "তাই নাকি!"

"হ্যাঁ, তাই। এখন মিস্টার মুখার্জির সম্বন্ধে আমি আপনার কাছে কিছু জানতে চাই।"

"বলুন।"

"মণিময় মুখার্জি লোকটি কেমন? কোনও অসৎ কাজ করতে পারেন বলে কি আপনার মনে হয়?"

একটু যেন ঝিমিয়ে গেলেন পল্লববাবু। বললেন, "মণিময় যে ধোয়া তুলসীপাতা, একথা আমি বলব না। তবে বড় কোনও ধরনের অসৎ কাজ করবে বলে আমার মনে হয় না।"

"ওঁর জন্য আপনার চাকরি গিয়েছে। তবু এত বড় সার্টিফিকেট দিচ্ছেন!"

দৃষ্টি শূন্যে ভাসিয়ে পল্লববাবু বলতে লাগলেন, "দোষ তো আমার ছিলই। ও তো আমায় মিথ্যে বলে ফাঁসায়নি। একটু অবশ্য বাড়াবাড়ি করেছে। আমার ফ্যামিলি সিচুয়েশন জানত। ওর পায়ে পর্যন্ত ধরেছি আমি। শুনল না, জানিয়ে দিল কোম্পানিকে।"

"আপনার ফ্যামিলি সিচুয়েশন বলতে?"

"আমার স্ত্রী অসুস্থ। দীর্ঘদিন ধরে শয্যাশায়ী। চিকিৎসার প্রচুর খরচ। আমি প্রায় নিরুপায় হয়ে অন্যায় কাজটা করছিলাম। মণিময় ব্যাপারটা ধরে ফেলার পর ওকে বলেছিলাম, 'একটা সুযোগ দে। আর কখনও করব না। খরচ চালানোর অন্য ব্যবস্থা করব।' শুনলই না কোনও কথা।"

"কিন্তু আমি যে শুনেছি মণিময়বাবু আপনাকে শুধরে নেওয়ার সময় দিয়েছিলেন। আপনি বরং উলটে ওঁকে দলে টানার চেষ্টা করেন।"

"বাজে কথা। আমার সামনে এসে বলুক দেখি।"

দীপকাকু, পল্লববাবু, দু'জনেই এখন চুপ। ঝিনুক নিজের ডিউটি করে যাচ্ছে, ফাইলের মধ্যে থাকা নোটবুকে লিখে নিচ্ছে জরুরি পয়েন্ট। বাচ্চাটার দরজা খোলার কারণটাও এখন পরিষ্কার, মা শয্যাশায়ী। বাড়িতে আর কেউ নেই।

দীপকাকু বলে ওঠেন, "আচ্ছা, আপনি বলছেন মণিময় ধোয়া তুলসীপাতা নন। অর্থাৎ টুকটাক শঠতা কোম্পানির সঙ্গে করে থাকেন। যেমন, ট্রাভেলিং অ্যালাউন্সের ফল্‌স বিল করা, ফোনে ডিলারের সঙ্গে কাজ সেরে নিয়ে কোম্পানিকে পুরো দিনের ডিউটি দেখানো। সেই মানুষটাই হঠাৎ সততার পরাকাষ্ঠা হয়ে তড়িঘড়ি আপনার চাকরিটা খেতে গেলেন কেন? আলাদা কোনও শত্রুতা?"

বড় করে শ্বাস ছেড়ে পল্লববাবু বললেন, "না, মণিময় আসলে ভীষণ স্বার্থপর। তার সঙ্গে প্রচণ্ড অ্যাম্বিশাস। ও জানত, কোম্পানির বিশেষ বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠার জন্য একটা বড়সড় এগজাম্পল দিতে হবে। আমার অপরাধটাকেই তাই হাতিয়ার করে নিল। ব্যস, সোজা পদোন্নতি, এগজিকিউটিভ র‍্যাঙ্ক!" অন্যমনস্ক হয়ে কী একটু ভাবলেন পল্লববাবু। ফের বলতে থাকলেন, "ও আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, জানেন। এ বাড়িতে অনেকবার এসেছে। আমার সংসারের অবস্থা সবই ওর জানা।"

একটা ভাইটাল পয়েন্ট পেয়ে গেল ঝিনুক। মণিময়দা বলেছেন, একবারই মাত্র এসেছেন এখানে। ঝিনুক পয়েন্টটা নোট করে নিল। অসঙ্গতিটা দীপকাকু বোধ হয় খেয়াল করলেন না। ফিরতি প্রশ্নে চলে গেলেন, "মণিময় যখন এত ঘনিষ্ঠ ছিলেন আপনার, আরও কয়েকটা স্বার্থপরতার উদাহরণ দিন না।"

"সালকিয়ায় নিজের ফ্যামিলির সঙ্গে না থেকে বেহালায় থাকা মণিময়ের অবশ্যই স্বার্থপরতা। পরিবারের লোক ওকে মিস করে। ওর সঙ্গেই সালকিয়ার বাড়িতে আমি গিয়েছি। আড়ালে ওর বাবা আমার কাছে দুঃখ করেছেন।"

"ওঁদের আর্থিক অবস্থা কেমন?"

"মোটামুটি। মণিময় সংসারে এক পয়সাও দেয় না। ওখানে যায়ই না প্রায়। অথচ শ্বশুরবাড়ি যেহেতু বড়লোক, হামেশাই যাতায়াত করছে। কিনে দিচ্ছে এটা-ওটা, এমনকী, সুনেত্রার পিসিঠাকুরমারও দেখভাল করছে। এসব কারণে মণিময়ের ভাইবোনেরাও ওকে পছন্দের চোখে দ্যাখে না।"

"তার মানে যা দাঁড়াল, মণিময় স্বার্থপর হলেও, বড় ধরনের কোনও অপরাধ করার মানুষ সে নয়।"

"না, ওই যে বললাম ওর প্রচণ্ড উচ্চাশা। অনেক উপরে উঠতে চায় মণিময়। টুরে গেলে আমরা যখন রাতে হোটেলে ফিরে আড্ডা দিতাম, ও হামেশাই বলত, 'আমি একদিন নিজে একটা কোম্পানির মালিক হব। লোকজন বলাবলি করবে, দেখেছ, সালকিয়ার একটা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে আজ কোথায় উঠেছে!'"একটু থামলেন পল্লববাবু। ফের বললেন, "আমার ধারণা ওর অসম্ভব উচ্চাশার কারণেই একদিন ফাঁদে পড়ে যাবে। হয়তো পড়েওছে, যে কারণে আপনি এসেছেন।"

"অর্থাৎ অজান্তেই কোনও অপরাধচক্রে জড়িয়ে পড়েছেন বলছেন?"

"আই থিঙ্ক সো," বলার পর পল্লব জানতে চাইলেন, "আচ্ছা, ও ঠিক কী ধরনের গোলমালে পড়েছে, বলা যাবে?"

"তদন্তের স্বার্থে এখনই বলা যাবে না। তবে আপনার সাহায্য আমার লাগবেই। পরে সবই জানতে পারবেন," কথা শেষ করে দীপকাকু একটু চুপ করে থাকলেন। ফের বলে ওঠেন, "এই যে মণিময় একটা কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছেন। এতে কি আপনি খুশি? ওঁর জন্যেই তো আপনার চাকরিটা গিয়েছে।"

"মিথ্যে বলব না, মণিময়ের উপর রাগ তো আমার আছেই। আমার কেসটায় অতটা নির্দয় না হলেও পারত। ওর একটা শিক্ষা হোক, আমিও চাই। একই সঙ্গে এটাও বলব, ক্ষতির বদলে ও আসলে

আমার উপকারই করেছে। চাকরি যাওয়ার পর প্রথম কিছুদিন আমি খুব কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালিয়েছি। অন্য কোনও কোম্পানি আমায় চাকরিতে নেয়নি। আমার কীর্তি কীভাবে যেন রটে গিয়েছিল। ইনডিপেন্ডেন্টলি মেশিন সারাইয়ে নেমে পড়লাম। দিনরাত ঘুরে কাজ জোগাড় করেছি। এখন সেই ক্রাইসিস পিরিয়ড অনেকটাই কেটে গিয়েছে।"

দীপকাকুর চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ পল্লব। থ্যাঙ্কস ফর ইওর কোঅপারেশন। আপনার ফোন নম্বর বা কার্ড একটা দিন।"

পল্লববাবুও উঠে দাঁড়িয়েছেন। টেবিলে রাখা ভিজিটিং কার্ডের বাক্স থেকে একটা কার্ড তুলে দীপকাকুকে দিলেন। ঝিনুক দীপকাকুর পাশে এসে দাঁড়াল। দীপকাকু ফের বললেন, "আপনি তখন বলছিলেন না, আমাকে সাহায্য করে আপনার কী লাভ? এবার শুনে রাখুন লাভটা কোথায়, আপনি যে অপরাধটা করেছিলেন, অনায়াসে আপনাকে জেলের ভাত খাওয়ানো যেত। কোম্পানির ড্রাফ্ট করে দেওয়া অপরাধ স্বীকারের চিঠিতে আপনি সইও করেছিলেন। খানিকটা দাক্ষিণ্য দেখিয়ে কোম্পানি আপনাকে চাকরি থেকে স্যাক করে। আর এখন যদি হেল্প না করেন, কোম্পানি ইচ্ছে করলেই আপনার অপরাধের ফাইল নিয়ে কোর্টে যেতে পারে।"

ডোজটা বোধ হয় একটু বেশিই হয়ে গেল। এমনিতে পল্লববাবু যথেষ্ট বিনয়ী আচরণ করেছেন এতক্ষণ। দীপকাকুর শাসানিতে ভীষণ কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, "না-না, আমি তখন কথার কথা বলছিলাম।"

উত্তরটাকে গ্রাহ্য না করে দীপকাকু বললেন, "আর হ্যাঁ, আমি যে এখানে এসেছি, আপনার পুরনো অফিসের কলিগরা যেন জানতে না পারে। কাউকেই না জানানো ভাল।"

"জানবে না। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।"

বাচ্চাটাকে আর দেখা গেল না। পল্লববাবু সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। রাস্তায় নামার আগে পল্লববাবুর দিকে না তাকিয়ে দীপকাকু বললেন, "আপনার স্ত্রীর সুস্থ হয়ে ওঠার চান্স কতটা?"

"চান্স যে নেই বলা যায় না। মুম্বই নিয়ে যেতে হবে। প্রচুর খরচ। মাসখানেক সব কাজ ছেড়ে আমাকে ওখানে গিয়ে থাকতে হবে। তারপরও যে ভাল হবে, ডাক্তাররা সেন্ট পারসেন্ট গ্যারান্টি দিতে পারছেন না। জানি না কতটা কী করতে পারব!"

"আপনি পারবেন। সব ঠিক হয়ে যাবে। মাথাটা ঠান্ডা রাখুন।"

দীপকাকু সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ক্রস করে ফুটপাতের চায়ের দোকানের সামনে বাইক দাঁড় করিয়েছেন। ঝিনুকের চায়ের নেশা নেই। ফুটপাতের চা অবশ্য মন্দ লাগে না। এক ভাঁড় সে-ও নিয়েছে।

"পল্লব ঘোষ লোকটাকে কেমন লাগল?" চা খাওয়ার ফাঁকে আলগা গলায় প্রশ্ন করলেন দীপকাকু।

ঝিনুক বলল, "খুব একটা খারাপ লোক বলে তো মনে হল না। জীবনে একটা ভুল করেছে, শুধরে নিয়ে স্বাভাবিক রাস্তায় চলে এসেছে।"

"এটা ভান নয়তো?" যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন দীপকাকু। ঝিনুক কোনও উত্তর দিল না। তার চা খাওয়া শেষ। ভাঁড় ফেলে দিল পাশে রাখা নির্দিষ্ট ডাব্বায়। রাতের রাজপথে আলোজ্বলা গাড়িগুলো শাঁ শাঁ করে ছুটে যাচ্ছে। সেই দিকে তাকিয়ে দীপকাকু বললেন, "পল্লব ঘোষের সঙ্গে কথা বলে মণিময় মুখার্জির সম্বন্ধে কী ধারণা হল তোমার?"

"মণিময়দাকে খুব একটা সুবিধের মনে হল না। আমাদের কিছু মিথ্যে কথা বলেছেন। কমপ্লেন করার আগে পল্লববাবুকে মোটেই সতর্ক করেননি। এই বাড়িটাও তিনি চিনতেন। এদিকে পল্লববাবু বন্ধুকে

একটা ব্যাপারে ক্লিনচিট দিচ্ছেন, বড় কোনও অপরাধ করার মানুষ সে নয়। কোম্পানিতে কেলেঙ্কারির বিষয়টা যেহেতু আপনার বানানো, মণিময়বাবুকে অপরাধমনস্ক বলার সুযোগ থাকছে না," ঝিনুকের টানা ব্যাখ্যার পর দীপকাকু ছোট্ট করে "হুম" বললেন। হাতের ভাঁড়টা বাস্কেটে ফেলে জিজ্ঞেস করলেন, "মণিময়ের পরিচিতজনদের মধ্যে সবচেয়ে আগে পল্লব ঘোষের কাছে কেন এলাম বলতে পারবে?"

ভাবার জন্য এতটুকু সময় ব্যয় না করে ঝিনুক চটজলদি "না" বলে। দীপকাকু আগের মতোই রাস্তার উপর চোখ রেখে বলতে থাকলেন, "এলাকায় বড় কোনও পুজো, অনুষ্ঠান থাকলে পুলিশ আগেভাগে দাগি দুষ্কৃতীদের লক আপে ঢুকিয়ে নেয়। দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রতিরোধ করার এটা প্রাথমিক সতর্কতা। গুন্ডাগুলো ছাড়া থাকলে যে কোনও গন্ডগোল বিরাট আকার নিতে পারে। আমি ঠিক এই কারণেই পল্লব ঘোষকে নজরবন্দি করলাম। অপরাধের হিস্ট্রি আছে ওঁর।"

কথা শেষ করে চাওলাকে দাম মেটালেন দীপকাকু। বাইকের দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বললেন, "আমার এই ভিজিটের কারণে আপাতত কিছুদিনের জন্য পল্লব ঘোষের দিক থেকে কোনও ক্রাইম করার সম্ভাবনা রইল না যদি না লোকটা পাকা অপরাধী হয়।"

"ঠিক কী ধরনের ক্রাইমের আশঙ্কা আপনি করছেন?" জিজ্ঞেস করে ঝিনুক।

বাইকে বসে হেলমেট পরার আগে দীপকাকু বললেন, "আগামী ঘটনাগুলো তার উত্তর দেবে।"

॥ ৪ ॥

কাল রাতে পল্লব ঘোষের সাক্ষাৎপর্বটা ঝিনুকের থেকে মন দিয়ে শুনলেন বাবা। মিনিট পনেরো চিন্তায় মগ্ন থেকে বলেছিলেন, "এতক্ষণে ধরতে পেরেছি।"

"কী বুঝলে?" জানতে চেয়েছিল ঝিনুক।

বাবা বলেছিলেন, "মণিময় এবং পল্লবের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও গোপন শত্রুতা আছে। তারা চায় না, সেটা বাইরের লোক জানুক। সম্ভবত দু'জনেই কোম্পানিকে ঠকাচ্ছিল নিজেদের কাজের পরিসরে। একে অপরের অপরাধটা জানত। যতটুকু আন্দাজ করা যায়, পল্লব জোট বাঁধতে চেয়েছিল মণিময়ের সঙ্গে। কন্ডিশন, চুরির টাকা আধাআধি হবে। মণিময় রাজি হয়নি। পথের কাঁটা দূর করতে চেয়ে পল্লবের কুকীর্তি কোম্পানিকে জানিয়ে দেয়।"

"তা হলে পল্লববাবু কেন মণিময়দার অপরাধ কোম্পানির কাছে জানালেন না?" প্রশ্ন করেছিল ঝিনুক।

বাবা বলেছিলেন, "মজা তো এখানেই। পল্লবের অপকীর্তির প্রমাণ জোগাড় করে ফেলেছিল মণিময়। পল্লবের হাতে ছিল না মণিময়কে ধরিয়ে দেওয়ার মতো কোনও সলিড এভিডেন্স। চাকরি যাওয়ার ফলে প্রমাণ সংগ্রহ তার পক্ষে আরওই অসাধ্য হয়ে উঠল। এরকমটা হবে জেনেই তড়িঘড়ি পল্লবের চাকরিটা যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল মণিময়।"

"অপবাদ মাথায় নিয়ে চাকরি হারানোর পর পল্লব গুলি খাওয়া বাঘ। কিছুদিন সময় লেগেছে নিজেকে গুছিয়ে নিতে। এবার সে প্রতিশোধ নেবে।"

"কীভাবে?"

বাবা বললেন, "প্যানিক তৈরি করে। পল্লবের কাছে যেহেতু মণিময়কে অপরাধী সাব্যস্ত করার মতো কোনও প্রমাণ নেই, ওকে আতঙ্কিত করে বাধ্য করবে কোনও ভুল স্টেপ নিতে। তাতে সমূহ ক্ষতি হবে মণিময়ের।"

"প্যানিক তৈরি করার জন্য পল্লববাবু মণিময়দার ডুপ্লিকেট জোগাড় করেছেন? এত সহজেই কি এরকম একই দেখতে দু'টো মানুষ পাওয়া যায়।"

"ইট্‌স আ কোইনসিডেন্স। মণিময়ের মতো দেখতে একটা লোককে পাওয়ার পরই প্ল্যানটা মাথায় আসে পল্লবের। আবার এমনও হতে পারে, মণিময়ের কোনও ভাইকে এ কাজে লাগিয়েছে পল্লব। মণিময় দীপঙ্করকে বলেছে, তাদের ভাই, দাদাদের প্রায় একই ধরনের দেখতে। ভাইরা যে মণিময়ের উপর খুশি নয়, এই তথ্য আমরা জানতে পারি পল্লব এবং মণিময় দু'জনের কাছ থেকেই।"

বাবার লজিকগুলো ঠিকঠাক লাগলেও গোড়ায় একটা গ্যাপ দেখতে পাচ্ছিল ঝিনুক। জোরালো কোনও ক্লু ছাড়া এতসব অ্যানালিসিসের কোনও মানেই হয় না। তাই সে বলেছিল, "তুমি এতটা শিওর হচ্ছ কী করে, ষড়যন্ত্রী পল্লববাবুই?"

বাবা বলেছিলেন, "মনে করে দ্যাখ, যখন তোরা মণিময়দের বাড়িতে কেসটা সবিস্তার শুনছিলি, পল্লবের নামটা সুনেত্রা তুলেছিল, মণিময় নয়। অথচ পল্লবই হচ্ছে ওর সবচেয়ে বড় শত্রু। মণিময়ের সর্বনাশ করতে চাওয়া লোকেদের মধ্যে পল্লবের নাম প্রথমেই আসবে।"

"পল্লববাবুর নাম চাপতে চাওয়ার কারণ?" প্রশ্ন করেছিল ঝিনুক।

বাবা বললেন, "দীপঙ্করের সঙ্গে আলাপের গোড়ায়ই মণিময় বুঝে নিয়েছিল গোয়েন্দাটি যথেষ্ট ঘাঘু। একে হালকা ভাবে নিলে পরে ভুগতে হবে। পল্লবের খোঁজ পেলেই তার অপকীর্তিগুলো প্রকাশ্যে চলে আসতে পারে। সেই কারণেই পল্লবের বাড়ির ঠিকানা দেয়নি। সুনেত্রা প্রসঙ্গটা উত্থাপন করার জন্য পল্লবের ঘটনাটা বলতে বাধ্য হয়েছিল। দীপঙ্কর তখনই টের পেয়ে যায়, এই কেসটার ভিতরে অন্য কোনও রহস্য আছে। নিজের তাগিদে তদন্তে নেমে পড়ে।"

দীপকাকুর তদন্তে বাবার স্পেকিউলেশন বেশিরভাগই বিফলে যায়। এবার কেন জানি ঝিনুকের মনে হচ্ছিল, বাবার ভাবনা সঠিক রাস্তা ধরেই এগিয়েছে। আপাতত কিছু ঘটনা ঘটার অপেক্ষা, যার সূত্র ধরে তদন্ত এগোবে। বড়সড় অপরাধমূলক ঘটনাটি কবে ঘটবে, ভগবান জানেন!

ছোট ঘটনার জন্য বেশি অপেক্ষা করতে হল না, কলেজে বেরনোর জন্য আজ রেডি হচ্ছিল ঝিনুক। মোবাইলে ফোন এসেছিল। শুধু নম্বর। ঝিনুক ফোনসেট কানে নিয়ে "হ্যালো" বলার পর অপর প্রান্ত নার্ভাস গলায় বলল, "ঝিনুক, আমি সুনেত্রাদি বলছি।"

মুহূর্তে সজাগ হয়ে ঝিনুক বলেছিল, "হ্যাঁ, বলুন।"

"আজ একটু আগে লোকটাকে নিজের চোখে দেখলাম। ভীষণ মিল মণিময়ের সঙ্গে," হাঁফধরা গলায় বলেছিলেন সুনেত্রাদি।

ওঁর এতটা ঘাবড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক ঠেকেছিল ঝিনুকের। বলেছিল, "এতে আশ্চর্যের কী আছে। ভদ্রলোক আপনাদের পাড়ায় থাকেন, দেখা তো হয়ে যেতেই পারে।"

"সেরকম হলে তো চিন্তা ছিল না। স্কুলের জন্য বেরিয়েছি, দেখি পার্কের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। প্রথমে এক ঝটকায় মণিময় মনে হয়েছিল। আমাদের বাড়ির দিকে তাকিয়েছিল লোকটা। দু'দিন হল মণিময় অফিস টুরে ধানবাদে। আমি ভাবলাম দেখি, সেই ডুপ্লিকেটটা কিনা? যেই না এগিয়েছি, লোকটা হনহনিয়ে পালাল।" সুনেত্রাদির সবিশেষ বর্ণনায় ঘটনার গুরুত্ব টের পেয়েছিল ঝিনুক, যে-কোনও কারণেই হোক ডুপ্লিকেটের টার্গেট সুনেত্রাদিরা। ঝিনুকের ভাবনার মাঝে সুনেত্রাদি ফের বলে উঠেছিলেন, "দীপঙ্করবাবুকে ঘটনাটা জানানোর জন্যই তোমাকে ফোন করছি। ওঁর ফোন নম্বর আমার কাছে নেই। উনি তো বলেছিলেন, কিছু ঘটলে জানাতে।"

"ঠিক আছে, আমি দীপকাকুর সঙ্গে কথা বলছি। দেখি, কী বলেন," বলে সুনেত্রাদির লাইন কেটে দীপকাকুর নম্বরে কল করেছিল ঝিনুক। ঘটনা শুনে দীপকাকু বললেন, "সুনেত্রা কি মণিময়কে জানিয়েছেন ঘটনাটা?"

"সেটা তো জিজ্ঞেস করিনি," বলেছিল ঝিনুক। প্রত্যাশিত ধমকও খেল। দীপকাকু বললেন, "এই প্রাইমারি কাজগুলো করতে পারছ না! মণিময়কে ফোন করেছেন কিনা জেনে সুনেত্রাকে জিজ্ঞেস করো, তাঁকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে? আমি দেখা করতে চাই।"

সঙ্গে-সঙ্গে নির্দেশ পালন করেছিল ঝিনুক। সুনেত্রাদি বললেন, মণিময়দাকে ফোনে ট্রাই করে পাওয়া যায়নি। আপাতত স্কুলে আছেন সুনেত্রাদি। দীপকাকু যদি মনে করেন ওঁর বাড়িতে আসবেন, ছুটি নিয়ে চলে আসতে অসুবিধে হবে না। ঝিনুক কথাগুলো জানিয়ে দিল

দীপকাকুকে।

উনি বলেছিলেন, "ঠিক আছে, জানিয়ে দাও আমি এখনই ওদের বাড়ি যাচ্ছি।" একটু থেমে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি বোধ হয় আসতে পারবে না, কলেজ আছে।"

"না-না, পারব। আজ একটাই মাত্র পাসের ক্লাস! সেটাও হয়তো হবে না।" দীপকাকুর ইনভেস্টিগেশনের প্রতিটি স্টেপে সঙ্গে না থাকলে কেসটা পরে গিয়ে বড্ড জটিল লাগে। সুনেত্রাদির বাড়ি নিজের মতো চলে আসতে বললেন দীপকাকু। ঝিনুক ট্যাক্সি নিত, বাবা বললেন, "আশুকে নিয়ে যা। আমার অফিস বেরোতে দেরি আছে।"

আশুদা বাবার গাড়ির ড্রাইভার। দীপকাকুর তদন্তে এই গাড়ি বহুবার ব্যবহার হয়েছে। তদন্তের কাজে বেরোতে হলে আশুদা বাড়তি এনার্জি পায়। ঝিনুক গাড়িতে গিয়ে বসতেই আশুদা বলেছিল, "কোনও কেস আছে, তাই না দিদিভাই?"

ঝিনুক তো অবাক। জিজ্ঞেস করেছিল, "তুমি কী করে বুঝলে?"

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে আশুদা বলেছিল, "তোমার জুতো দেখে।"

স্নিকার্স পরেছে ঝিনুক। ইনভেস্টিগেশন থাকলে এরকমই কিছু একটা পরে। কোথায় কখন দৌড়ঝাঁপ করতে হয়, কোনও তো ঠিক নেই! দীপকাকুর সামান্য সংস্পর্শে এসে আশুদার মধ্যেও গোয়েন্দার গুণাবলি প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। সুনেত্রাদির দেওয়া খবরে বাবা ভীষণ কনফিউজড হয়ে গিয়েছেন। ফোনে যখন কথা চালাচ্ছিল ঝিনুক, এক প্রান্ত শুনেছেন বাবা। তাতেই অনেকটা বুঝে নেন, ঝিনুককে আর কোনও প্রশ্ন করেননি। নীচের ঠোঁট উলটে মাথা নাড়তে-নাড়তে বলেছিলেন, "মনে হচ্ছে পল্লব ঘোষ নয়। অন্য কেউ আছে এর পিছনে। পাকা অপরাধীরও সাহস হবে না গোয়েন্দা দেখা করে যাওয়ার পরের দিন কাজ চালিয়ে যাওয়ার।"

ঝিনুক বাড়ি থেকে বেরনোর মুখে বাবা বলেছিলেন, "চোখ-কান খোলা রাখিস, বুঝলি। কেসটা ইন্টারেস্টিং টার্ন নিচ্ছে।"

সত্যিই এবার থেকে পুরোপুরি সজাগ থাকবে ঝিনুক। ডুপ্লিকেট যখন ওয়াচ করছে মণিময়দার বাড়ি, কিছু একটা মতলব তো আছেই। বেহালার রামকৃষ্ণ নগর চিনতে অসুবিধে হয়নি আশুদার। গাড়ি পার্কটার কাছে পৌঁছে গিয়েছে। রাস্তার ওপারের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন দীপকাকু আর সুনেত্রাদি। বাইক স্ট্যান্ড করা দীপকাকুর পিছনে।

পিছন ফিরে ঝিনুককে গাড়ি থেকে নামতে দেখলেন দীপকাকু, সুনেত্রাদির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "আপনারা বাড়ি গিয়ে বসুন, আমি আসছি।"

ঝিনুক হাঁটতে হাঁটতে সুনেত্রাদিকে প্রশ্ন করে, "কোথায় গেলেন দীপকাকু?"

"পাড়াটা একবার ঘুরে দেখতে।"

"কেন?"

"আমি স্কুল থেকে ফিরছি, উনি পাশে বাইক দাঁড় করালেন। এত তাড়াতাড়ি চলে আসবেন, ভাবতেই পারিনি। আমার কাছে ডিটেলে সব জানতে চাইলেন, লোকটা কোথায় দাঁড়িয়েছিল, ড্রেস কী ছিল, পালাল কোন দিকে?"

সুনেত্রাদির কথা থেকে একটাই প্রশ্ন তুলে নিল ঝিনুক, "কী ড্রেস পরেছিল আজ?"

"এমনি, সাধারণ শার্ট-প্যান্ট। এত অর্ডিনারি ড্রেস মণিময় কখনওই পরে না। কিন্তু দু'জনের মধ্যে সিমিলারিটি প্রচুর। চেনা লোকজনের ভুল হতেই পারে।"

"আপনার হয়েছিল?" জানতে চায় ঝিনুক।

সুনেত্রাদি মাথা নাড়লেন। বললেন, "কয়েক সেকেন্ডের জন্য ধন্দে পড়ে গিয়েছিলাম। তারপরই বুঝে যাই, ও নয়। মণিময় হওয়ারও তো কোনও কারণ নেই। সে আছে ধানবাদে। তা ছাড়া নিজের বাড়ির দিকে কেউ ওভাবে তাকিয়ে থাকে! লোকটাকে সামনে থেকে দেখার জন্য কয়েক পা এগিয়েছি, একেবারে পড়িমড়ি করে দৌড়ল। আমার যা নার্ভাস লাগছিল না, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পুরো ঘেমে গিয়েছিলাম।"

সুনেত্রাদির কথা শুনে অসময়ে হাসি পেয়ে গেল ঝিনুকের, লোকটা যার জন্য ভয়ে পালাল, সে উলটে নার্ভাস! গেট খুলে দরজার কাছে পৌঁছেছে ঝিনুকরা।

সুনেত্রাদি ঘরে ঢুকে ঝিনুককে বসতে বলে ভিতরে গেলেন। সোফায় বসেছে ঝিনুক। আগের দিনও লক্ষ করেছে, কিছু বই খোলা অবস্থায় উলটো করে রাখা সোফা, ক্যাবিনেট, সেন্টার টেবিলের উপর। কোনওটাই গল্প উপন্যাসের বই নয়, সবই অ্যাকাডেমিক। এ বাড়িতে সিরিয়াস পড়ুয়ার উপস্থিতি নিয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়।

ফ্রেশ হয়ে শাড়ি চেঞ্জ করে গাউন পরিহিত সুনেত্রাদি ঘরে ফিরলেন।

সোফায় এসে বসতে-বসতে বললেন, "চা ভিজিয়ে দিয়ে এলাম। দীপঙ্করবাবু এলে একসঙ্গে খাওয়া যাবে।"

সুনেত্রাদির কথা শেষ হতেই বাইরে থেকে ঘরে এলেন দীপকাকু। একটু যেন পরিশ্রান্ত। ঝিনুকের মুখোমুখি সিঙ্গল সোফার দিকে যেতে-যেতে বললেন, "আপনাদের পাড়াটা বেশ বড়। প্রচুর বাড়ি, ফ্ল্যাটবাড়ি। অনেক গলি, রাস্তা।"

কমেন্ট যেহেতু সুনেত্রাদির উদ্দেশে, উত্তর দিলেন, "আমিও সব রাস্তা চিনি না। একবার স্কুল ফেরার পথে নতুন রাস্তা ট্রাই করতে গিয়ে বাড়ি হারিয়ে ফেলেছিলাম।"

নিজের কথায় নিজেই হাসছেন সুনেত্রাদি। এখন আর ভয়ের লেশমাত্র নেই ওঁর চেহারায়। ভারী ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার! মানুষটিকে ক্রমশ ভাল লেগে যাচ্ছে ঝিনুকের। দীপকাকু বসেছেন সোফায়। সুনেত্রাদিকে জিজ্ঞেস করলেন, "ফোনে পাওয়া গেল?"

মণিময়দার কথাই বলছেন দীপকাকু। সুনেত্রাদি বললেন, "আর ট্রাই করিনি। কী দরকার, আপনারা এসে গিয়েছেন, ভয় কেটে গিয়েছে আমার।"

"সে না হয় ঠিক আছে। কিন্তু মণিময়ের অনুমতি ছাড়া কি আমরা কাজ শুরু করতে পারি? আপনি বললে অবশ্য করাই যায়। ওঁর সঙ্গে শেষ যা কথা হয়েছিল, তাতে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ ছিল না।"

সুনেত্রাদি খানিকটা থতমত হয়ে গিয়েছেন। বললেন, "আপনার সঙ্গে মণিময়ের এগজাক্টলি কী কথা হয়েছিল আমি জানি না অথবা মনে নেই।"

দীপকাকু সুনেত্রাদির কাছে জানতে চান, "মণিময় ধানবাদে গেলে কোথায় ওঠেন, কোনও হোটেলে না অফিসের গেস্ট হাউসে?"

"প্যারাডাইস হোটেলে ওঠে। অফিসের গেস্ট হাউস কিছু নেই।"

"প্যারাডাইসের ফোন নম্বর আছে আপনার কাছে?"

"কেন বলুন তো?" আবার মুখে-চোখে ভয় ফিরে আসে সুনেত্রাদির।

দীপকাকু বললেন, "হোটেলে ফোন করে দেখি, যদি থাকেন কথা হয়ে যাবে। না থাকলে হোটেলের লোককে বলব, উনি ফিরলেই যেন আপনার সঙ্গে কনট্যাক্ট করেন।"

"হোটেলের নম্বরটা দিয়েছিল বোধ হয়। কোথায় যে রেখেছি! ফোনে কি সেভ করা আছে?" প্রশ্নগুলো নিজেকেই করলেন সুনেত্রাদি।

দীপকাকু বললেন, "ফোনের নোটবুকে লিখে রেখেছেন।"

সুনেত্রাদি বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন দীপকাকুর দিকে, কনফিডেন্স দেখে অবাক হয়েছেন। উঠে গেলেন টিভির নীচে থাকা ক্যাবিনেটের কাছে। কাচের শাটার সরিয়ে বের করলেন ফোন নম্বরের নোটবুক। পাতা উলটে এক জায়গায় থামলেন, মুখে খুশির আভা। অর্থাৎ পেয়েছেন নম্বর। সপ্রশংস দৃষ্টি এখন দীপকাকুর দিকে। বাহবা গ্রহণ করলেন না দীপকাকু। বললেন, "কম দরকার পড়ে, অথচ জরুরি ফোন নম্বর লোকে নোটবুকে লিখে রাখে।"

নোটবুকটা খোলা অবস্থায় দীপকাকুর কাছে নিয়ে এলেন সুনেত্রাদি। নিজের সেলফোন বার করে নোটবুকটা এক হাতে নিয়ে হোটেলের নম্বর টিপছেন দীপকাকু। ভিতর ঘর থেকে মৃদু শব্দে রিংটোন বেজে উঠল। শশব্যস্ত হয়ে সুনেত্রাদি বললেন, "মনে হচ্ছে ওর ফোনই এল।'

ঘর ছাড়লেন সুনেত্রাদি। দীপকাকুর আঙুল চালনা দেখে বোঝা

যাচ্ছে, নাম আর হোটেলের নম্বরটা সেভ করে নিচ্ছেন। মণিময়দার ফোনই এসেছে, সকালের ঘটনার বর্ণনা দিতে-দিতে সুনেত্রাদি ঘরে এলেন। ঝিনুকরা যে এসেছে, এ কথাও জানালেন। কান থেকে ফোনসেট নামিয়ে দীপকাকুকে বললেন, "আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।"

সুনেত্রাদির সেট কানে লাগিয়ে দীপকাকু বললেন, "হ্যাঁ, বলুন।"

ও প্রান্তের কথা শোনার উপায় নেই। দীপকাকুর এক্সপ্রেশন থেকেও কিছু বোঝা যাচ্ছে না। নির্বিকার শ্রোতা হয়ে আছেন। খানিকক্ষণ পর "ঠিক আছে, বুঝেছি," বলে ফোন অফ করলেন। সেটটা সুনেত্রাদিকে ফেরত দিয়ে বললেন, "মণিময় ঘটনাটাকে এতটা সিরিয়াসলি না নিতেই বলছেন।"

"কারণ?" ভ্রু কুঁচকে জানতে চান সুনেত্রাদি।

ঠোঁটের কোণে হাসি ঝুলিয়ে দীপকাকু বলতে থাকলেন, "মণিময়ের বক্তব্য হল, লোকটা যে আপনাদের পাড়ায় আছে, মানে নতুন এসেছে, তার প্রমাণ তো আমরা পেয়েইছি। কিন্তু লোকটা আদৌ আপনাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল কিনা, এ ব্যাপারে মণিময়ের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আপনার অবজারভেশনের উপর নাকি নির্ভর করা ঠিক হবে না। আপনি খুবই বেখেয়ালি মানুষ।"

'বেখেয়ালি' শব্দটার ধাক্কাতেই বুঝি সুনেত্রাদি বলে উঠলেন, "এই রে, চা ভিজিয়েছি; আপনাদের দেওয়াই হল না এখনও।"

সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেও কিচেনে গেলেন না সুনেত্রাদি, ভ্রু কুঁচকে দীপকাকুর কাছে জানতে চাইলেন, "আর কী বলল মণিময়?"

হাসিটা প্রশস্ত হল দীপকাকুর ঠোঁটে। বললেন, "আপনি চরিত্রেও আউট অ্যান্ড আউট দিদিমণি। স্কুলে যথেষ্ট রাগী বলেই পরিচিত। আপনি যখন কারও উপর অসন্তুষ্ট হয়ে এগিয়ে যান, সেটা তেড়ে যাওয়ার মতোই হয়। লোকটা ঘাবড়ে গিয়ে পালিয়েছে। সে হয়তো অন্য কাজে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল।"

"ও, এই কথা বলেছে?" কপট অভিমানের সঙ্গে নিশ্চিত হতে চাইলেন সুনেত্রাদি।

উত্তরে দীপকাকু বললেন, "আপনি একবার ফোন করে জেনে নিন।"

"ফোন নয়, ফিরুক, ওকে দেখাচ্ছি আমি!" বড়-বড় পা ফেলে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন সুনেত্রাদি।

দীপকাকু সেন্টার টেবিলে খোলা অবস্থায় উলটো করে রাখা বইটা তুলে নিলেন। ঝিনুক আগেই দেখেছে বইটার নাম, 'ইনট্রোডাকশন টু ইলেকট্রোডায়নামিক'। পাতা উলটেপালটে দেখে বইটা যথাস্থানে রেখে দীপকাকু উঠে পড়লেন। বইয়ের র‍্যাকের দিকে এগোচ্ছেন, ঝিনুক চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে, "কী বুঝছেন?"

"জটিল কেস, নোট নিচ্ছ না কেন?" বললেন দীপকাকু।

ট্রেতে তিনটে চায়ের মগ নিয়ে ঘরে ফিরলেন সুনেত্রাদি। দীপকাকু ফিরে এলেন সোফায়। ঝিনুক চায়ের ব্যাপারে আর না করবে না। ভুলোমনের মানুষের অস্বস্তি বাড়িয়ে কাজ নেই।

তিনজনেই চায়ের মগ তুলে নিয়েছেন।

"তা হলে কী বুঝছেন, একটা ইনভেস্টিগেশন তো করা উচিত? লোকটা কে, কী তার মতলব?" বললেন সুনেত্রাদি।

মগটা দু' হাতে ধরে কপালে ভাঁজ নিয়ে দীপকাকু বলতে থাকলেন, "লোকটা দোকানের ধার মিটিয়ে দেওয়ার ফলে মনে হয়েছিল কেসটা নিয়ে ভাবার কিছু নেই। কিন্তু আপনি আজব ঘটনা যা বললেন, চিন্তা হওয়ারই কথা। আবার মণিময় যা বলছেন...।"

দীপকাকুকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সুনেত্রাদি বলে উঠলেন, "ওর কথা ছাড়ুন। আপনি তদন্ত চালান। ও নিজের চোখে দেখলে বুঝত ঘটনা কতটা জেনুইন এবং সিরিয়াস।"

ঝিনুক বুঝতেই পারছে কেসটা এরা না দিলেও দীপকাকু কাজ চালিয়ে যেতেন। চায়ে শেষ চুমুক মেরে দীপকাকু মগ নামিয়ে রাখলেন সেন্টার টেবিলে। বললেন, "আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করি।"

"করুন," নড়েচড়ে প্রস্তুত হলেন সুনেত্রাদি।

"এই বাড়িতে এমন কোনও দামি জিনিস আছে, যা চুরি গেলে আপনাদের ক্ষতি তো হবেই, চোরের লাভ হবে বেশি অর্থাৎ ব্যাঙ্কের বই, জীবনবিমার পলিসির কথা বলছি না। চোরের ওতে কোনও লাভ হবে না। আপনারা সমস্যায় পড়বেন।"

দীপকাকুর কথা বুঝে নিয়ে সুনেত্রাদি বললেন, "বাড়িতে হিরে-জহরত কিছু আছে কিনা জানতে চাইছেন তো? নেই। সোনার গয়নাও অতি সামান্য। আমার খুব একটা ঝোঁক নেই।"

"আপনার শ্বশুরবাড়ি কিংবা বাপের বাড়িতে দামি ওরকম কিছু আছে কি? মণিময়ের ডুপ্লিকেট গিয়ে হয়তো হাতিয়ে নিয়ে এল। ওঁরাই লোকটাকে মণিময় ভেবে হাতে তুলে দিলেন।"

ভাবতে-ভাবতে মাথা নাড়ছেন সুনেত্রাদি। বললেন, "আমার অন্তত জানা নেই। শ্বশুরবাড়ির ইকনমিক কন্ডিশন ভাল নয়। সে বাড়িতে ওই ধরনের কিছু থাকার প্রশ্নই ওঠে না। আমার বাড়ির অবস্থা মোটামুটি ভাল। সোনাদানা যা কিছু আছে, বাবা ব্যাঙ্কের ভল্টে রাখেন।"

"শুধু সোনাদানার কথা ভাবলে চলবে না। কিউরিও কিছু, প্রাচীন মূর্তি বা অন্য কোনও জিনিস?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

"না, সেসব কিছু দু'বাড়িতেই নেই। সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। প্রাচীন জিনিস আগলে আছেন, এমন কারও কথা মাথায় আসছে না।"

সুনেত্রাদি কথা শেষ করার পর একটু বিরতি নিলেন দীপকাকু। ভাবছেন, ফের পরের প্রশ্নে গেলেন, "আজব লোকটা মণিময়ের ভাইয়েদের মধ্যে কেউ নয়তো? ওঁরা যখন সব একই ছাঁচের দেখতে। বিশেষ করে মণিময়ের নিজের দাদা বা ভাই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যেহেতু ওরা সহোদর।"

সুনেত্রাদি বললেন, "না। আমি যে ডিসট্যান্স থেকে লোকটাকে লাস্ট পুরোপুরি দেখেছি, ওরা কেউ নয়। দূর থেকে তো মণিময় বলেই ভুল হয়েছিল আমার।"

"ওঁদের সঙ্গে শেষ কতদিন আগে দেখা হয়েছিল আপনার?"

"খুব বেশিদিন নয়, মাসদুয়েক হবে হয়তো। মণিময়ের বড়দার মেয়ের বার্থডে ছিল।"

"এমনই তো হতে পারে, কোনও একজন চেহারাটা একটু অদলবদল করে নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে ওয়াচ করছিল বাড়িটার।"

দীপকাকুর এই কথার পর সুনেত্রাদি একটু ভেবে নিয়ে বলতে থাকলেন, "তাই যদি বলেন, লোকটার সঙ্গে মণিময়ের ছোট ভাইয়ের বেশি মিল। মণিময় সামান্য রোগা, চশমা পরে না, ড্রেসে চাকচিক্য নেই। কিন্তু সে কি এ ধরনের কাজ করবে? তেমন বুদ্ধিশুদ্ধি তার নেই। একটু বোকাহাবা গোছের।"

"বুদ্ধি থাকলে কি আপনার চোখে পড়ে যায়? বাড়িটাকে সে লক্ষ করত আড়াল থেকে," বললেন দীপকাকু।

"তা হলে কি কেউ কাজে লাগাচ্ছে মণিময়দার ভাইকে?" প্রশ্নটা রাখল ঝিনুক।

দীপকাকু আত্মমগ্ন কণ্ঠে বললেন, "হতে পারে।"

"কে সে?" জানতে চাইলেন সুনেত্রাদি।

"এখনও তো কাজই শুরু করিনি, কী করে বলব।"

ঝিনুক বুঝতেই পারছে দীপকাকু সত্যিটা এড়িয়ে গেলেন। ওঁর সন্দেহ পল্লব ঘোষকে। যিনি কাজে লাগাতে পারেন মণিময়দার ডুপ্লিকেটকে।

দীপকাকু বলে ওঠেন, "আচ্ছা, আপনার কাছে মণিময়ের ভাইদের ফোটো আছে? পারিবারিক কোনও জমায়েতের ফোটো হলেও চলবে। কোনও ফ্যামিলি ফোটো অ্যালবাম?"

"হ্যাঁ, আছে। আনছি," বললেন সুনেত্রাদি। উঠে গেলেন ফোটো আনতে।

দীপকাকুর কপালে ভাঁজ, থুতনিতে মুঠোর সাপোর্ট। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন টেবিলের বইটার দিকে। বইটাই দেখছেন, নাকি অন্য কিছু ভাবছেন বোঝা যাচ্ছে না। সুনেত্রাদি বড় সাইজের ফোটো অ্যালবাম নিয়ে ফিরে এলেন। সোফায় বসে বললেন, "আমাদের বিয়ের অ্যালবাম। এখানে বাড়ির সকলেরই ফোটো পাওয়া যাবে।"

অ্যালবামের পাতা উলটে একপাতায় থামলেন সুনেত্রাদি। একটা গ্রুপ ফোটো দেখিয়ে বললেন, "এই যে সব ভাইরা। একজন শুধু নেই।"

"কে?" জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকু।

সুনেত্রাদি বললেন, "ওর জ্যাঠামশাইয়ের বড় ছেলে। যিনি মুম্বইয়ে থাকেন। ছুটি পাননি অফিস থেকে। পরে এসেছিলেন। তাঁর ফোটোও এই অ্যালবামেই আছে। দেখাব?"

"দাঁড়ান। পরে দেখছি," বলে দীপকাকু হাইপাওয়ারের চশমা সমেত চোখ নামিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন পাঁচ বাই সাত ইঞ্চির ফোটোটা। ঝিনুক একটু দূর থেকে দেখছে, সত্যি কী অদ্ভুত মিল ভাইদের চেহারায়! বরবেশে না থাকলে মণিময়দাকে চেনা যেত না। ভাইরা পাঁচজন দাঁড়িয়ে আছেন, সুনেত্রাদি কনের সাজে সিংহাসনে বসে। দারুণ গর্জাস লাগছে তাঁকে। দীপকাকু প্যান্টের পকেট থেকে যথারীতি বের করলেন ম্যাগনিফায়িং গ্লাস। সুনেত্রাদি একটু হলেও হতচকিত। উনি তো জানেন না, প্যান্টের দু' পকেটে আরও কত কী আছে! ইনভেস্টিগেশন টুল্‌স-এর ছোটখাটো মিউজিয়াম।

আতশকাচ উপর-নীচ করে ফোটোটা আরও সূক্ষ্ম ভাবে দেখে নিয়ে মুখ তুললেন দীপকাকু। বললেন, "গয়না তো ভালই পরেছেন দেখছি। এখন যা সোনার দাম, এ তো অনেক টাকার ব্যাপার। কোথায় রেখেছেন গয়নাগুলো?"

একটু বুঝি লজ্জা পেলেন সুনেত্রাদি, খানিক আগেই বলেছেন গয়নার প্রতি ঝোঁক নেই। এখন বললেন, "ওগুলো মায়ের শখ। শ্বশুরবাড়ি থেকেও কিছু পেয়েছি। উৎসব-অনুষ্ঠানে পরার মতো অল্প কিছু রেখে বেশিরভাগটাই ব্যাঙ্কের লকারে রাখা হয়েছে।"

"লকার। কার নামে আছে?"

"আমার মায়ের নামে। বাবা অনেকদিন ধরেই বলছেন আমাদের নামে একটা লকার অ্যাপ্লাই করতে, হয়ে উঠছে না। আসলে ওই গয়নাগুলো নিয়ে আমার আলাদা একটা প্ল্যান আছে। লকারে রাখার দরকার পড়বে না।"

"কী প্ল্যান?"

"ওই একটু দানধ্যান গোছের আর কী।"

বোঝাই যাচ্ছে সুনেত্রাদি পুরোটা ভেঙে বলতে চাইছেন না। তবু দীপকাকু জানতে চাইলেন, "কোথায় এবং কোন সময় চ্যারিটিটা করতে চাইছেন, জানলে সুবিধে হত।"

"যেখানে ডোনেট করব, সেখানকার একজন ছাড়া আমার নাম জানবে না কেউ। প্রকাশ্যে দান করে নিজের বড়াই করতে চাই না। কোন সময় সেটা করব এখনও ঠিক করিনি।"

"এই চ্যারিটির ইচ্ছেটা মণিময় জানেন? তাঁর আপত্তি নেই তো?"

"আমার জিনিস আমি কী করব, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। ওর আপত্তি শুনতে যাব কেন? ইচ্ছেটা অবশ্য মণিময়কে বলেছি। ও বলছিল, চ্যারিটি বিগিন্‌স অ্যাট হোম। আমাদের বাড়ি নেই, টাকাটা বাড়ি কেনার জন্য খরচ করা উচিত।"

"আপনি কি বললেন?"

"কী আবার বলব, আমাদের বাড়ি তো আছে। সালকিয়ার বাড়ির সামান্য হলেও কিছুটা অংশ তো মণিময়ের প্রাপ্য। এ ছাড়া, আমার পুরনো বাড়ি, পুরোটাই আমাদের হবে। আমি বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। এসব বাদ দিয়েও ফ্ল্যাট বা বাড়ি কেনার জন্য সহজেই আমি ব্যাঙ্ক লোন পাব, যেহেতু সরকারি চাকরি করি। ডোনেশানের জন্য তো ব্যাঙ্ক লোন দেবে না।"

সুনেত্রাদির কথা শেষ হওয়ার পর দীপকাকু অ্যালবাম কোলে রেখে ভাবতে শুরু করলেন। ঝিনুক এই ফাঁকে বেশ কয়েকটা পয়েন্ট নোটবুকে লিখে নিল। ভাবনা থেকে ফিরে দীপকাকু বললেন, "মণিময়ের জ্যাঠতুতো দাদার ফোটোটা দেখান, যিনি বাইরে থাকেন।"

সুনেত্রাদি দীপকাকুর কোলে থাকা অ্যালবামের পাতা উলটে একটা ফোটোতে আঙুল রাখলেন, "এই যে, ওঁদের একটা ফোটোই এই অ্যালবামে আছে।"

ঝিনুকও দেখছে, সমুদ্রের ধারে স্বামী-স্ত্রী। বড়দার সঙ্গে মণিময়দার অনেকটাই অমিল। এঁর মাথার সামনে চুল প্রায় নেই। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। বয়সের তফাতটাও দিব্যি বোঝা যাচ্ছে। ওঁর স্ত্রীর পরনে সালোয়ার কামিজ, চেহারা বেশ ভারী।

দীপকাকু বলে উঠলেন, "গোয়া।"

"হবে, হয়তো। আমি এখনও যাইনি।"

"অ্যালবামের অন্য ফোটোগুলো দেখতে পারি?"

"ওঃ, শিওর। সচ্ছন্দে," বলে সুনেত্রাদি ফিরলেন ঝিনুকের দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কী সাবজেক্ট?"

"এলা, আমি একই সাবজেক্ট নিয়ে পড়ি।"

"ও, হ্যাঁ। তোমাদের কলেজও তো এক। তোমার ভাল নাম আঁখি, আঁখি সেন, এলা আমায় বলেছে। তোমাদের বাড়িটা যেন কোথায়?"

এরকম সাধারণ প্রশ্ন-উত্তর চলতে লাগল। দীপকাকু অ্যালবামের পাতা উলটে যাচ্ছেন, কোনও-কোনও পাতায় বেশিক্ষণ থামছেন। একসময় শেষ হল ফোটো দেখা। অ্যালবাম বন্ধ করে সেন্টার টেবিলে রাখলেন। সুনেত্রাদিকে বললেন, "আপনাদের টয়লেটটা কি একটু ইউজ করতে পারি?"

"অবশ্যই। এ ঘর থেকে বেরিয়ে ডান দিকে।"

সুনেত্রাদির নির্দেশ শুনে উঠে গেলেন দীপকাকু। তদন্তের কাজে এসে কারও বাড়ির টয়লেট ইউজ করতে দীপকাকুকে আগে কখনও দেখেনি ঝিনুক।

ঝিনুকদের কথোপকথন খুব একটা এগোয়নি, ফিরে এলেন দীপকাকু। চশমা খুলে রুমাল দিয়ে মুছতে-মুছতে সোফায় এসে বসলেন। সুনেত্রাদির উদ্দেশে বললেন, "সায়েন্সের যেসব ভারী-ভারী বই আপনি পড়েন, স্কুলে পড়ানোর জন্য এত চর্চা লাগে না। আপনি কি কলেজে পড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন?"

"একেবারেই না। প্রোফেসরি করার কোনও ইচ্ছে নেই। কোয়ালিফিকেশন থাকা সত্ত্বেও নেট কিংবা স্লেট কোনও পরীক্ষাই দিইনি। পিএইচ ডি'টা অবশ্য করে রাখব ভাবছি। সেটা চাকরির জন্য নয়, এমনি।"

সুনেত্রাদির কথায় দীপকাকুর মুখে সামান্য বিস্ময় ভাব ফুটে উঠল। জানতে চাইলেন, "প্রোফেসরির ইচ্ছে নেই কেন?"

"ছোটদের পড়াতেই আমার বেশি ভাল লাগে। পড়ানো ছাড়াও তাদের মানুষ করার দায়িত্বটা পাওয়া যায়। কলেজে ছাত্রছাত্রীরা মানুষ হয়েই আসে।"

ভ্রু তুলে প্রশংসার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন দীপকাকু। জিজ্ঞেস করলেন, "এই আদর্শটা আপনি কি কোনও মনীষীর জীবন থেকে পেয়েছেন?"

একটু সময় নিয়ে সুনেত্রাদি ভাবনার মাঝ থেকেই বলতে লাগলেন, "হ্যাঁ, মনীষী তো বলাই যায়। ইনি হচ্ছেন আমার পিসিঠাকুরমা, আমার ঠাকুরদার বোন। নিজের সমস্ত সম্পদ উৎসর্গ করেছেন অভাবী ছাত্রদের জীবন গঠনের জন্য।"

"উনি কোথায় থাকেন, ওঁর কাজটা যদি একটু বিশদে বলেন...,"

দীপকাকুর কথা শেষ হওয়ার আগেই সহাস্যে সুনেত্রাদি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কী করে ধরে নিচ্ছেন, উনি এখনও জীবিত? আমার ঠাকুরদার বোন, কত বয়স হতে পারে বলুন তো?"

"আমি ধরে নিইনি, নিশ্চিত হয়ে বলছি। পঁচাশি-নব্বইয়ের আশপাশে ওঁর বয়স।"

দীপকাকুর উত্তর শুনে চোখ বড়-বড় হয়ে গিয়েছে সুনেত্রাদির। বলে ওঠেন, "একদম ঠিক। আপনি তো জ্যোতিষীদের মতো প্রেডিকশন করছেন দেখছি! যদিও জ্যোতিষে আমার কোনও বিশ্বাস নেই। কিন্তু আপনার কনফিডেন্স দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছি!"

"ওঁর কাজ আর বাসস্থানটা কিন্তু আমি জানি না," প্রশংসা গায়ে না মেখে বললেন দীপকাকু।

সুনেত্রাদি বলতে থাকলেন, "আমি 'পিসিদিদা' বলে ডাকি। গোবরায় দশ কাঠা জমির উপর দোতলা বাড়ি। ওই বাড়িতেই অভাবী

ছাত্রছাত্রীদের হস্টেল। তাদের থাকা, পরা, খাওয়া এমনকী, টিউশনির খরচও পিসিদিদার সংস্থার। বাইরে থেকে টিচার এসে পড়িয়ে যান। ওখানকার ছেলেমেয়েরা কলকাতার বিভিন্ন স্কুলের নানান শ্রেণিতে পড়ে। পিসিদিদার বাড়িটাকে মোটামুটি একটা আশ্রম বলা যায়।"

"এ তো বিরাট কর্মযজ্ঞ। খরচও অনেক। টাকাপয়সা আসে কোথা থেকে?"

"কিছু শুভানুধ্যায়ী নিয়মিত ডোনেশান দেন। সরকারি সাহায্য নামমাত্র। বাকিটা পিসিদিদার। পিসিদাদু ব্যারিস্টার ছিলেন। টাকাপয়সা ভালই রেখে গিয়েছেন। এখন অবশ্য স্টুডেন্ট অনেক বেড়েছে, দামও বেড়েছে জিনিসপত্রের। পিসিদিদার বেশ সমস্যা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটা চালাতে।"

"আচ্ছা, এবার একটা অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক। আপনার কি মনে হয় না, মণিময়ের ডুপ্লিকেটের উদয় হওয়াটা আপনাদের চেনা-পরিচিত ঘনিষ্ঠ লোকজনকে জানিয়ে রাখা ভাল? মণিময়ের অফিস এবং ডিলারদেরও ইনফরমেশন দেওয়া উচিত। বোঝা তো যাচ্ছে না লোকটার মতলব কী? কখন কোথায় মণিময়ের পরিচয় নিয়ে অনিষ্ট করে বসবে!"

"কথাটা যে আমি ভাবছি না, তা নয়। একটা অন্য সমস্যাও আছে। খবরটা সকলের কাছে দেওয়া থাকলে সত্যিকারের মণিময়কেও তারা প্রথমে জাল বলে মনে করবে। প্রতিবার নিজের আইডেন্টিটি প্রমাণ করতে হবে মণিময়কে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কোথাও একটা হাসির খোরাক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে।"

সুনেত্রাদির কথাগুলো মন দিয়ে শোনার পর দীপকাকু একটু ভেবে নিলেন। তারপর বললেন, "ঠিক আছে। তবে আপনার গয়নাগুলো লকার থেকে আনা এবং ডোনেট করার প্রসেসটায় একটু অ্যালার্ট থাকবেন।"

"অবশ্যই থাকব। এক্ষুনিই তো করতে যাচ্ছি না ডোনেট।"

"আজ তা হলে উঠি," বলে সোফা ছেড়ে দাঁড়ালেন দীপকাকু। ঝিনুকও উঠে পড়ে। সুনেত্রাদি জিজ্ঞেস করলেন, "কেসটা কোথা থেকে শুরু করবেন? মানে আপনার এনকোয়ারির পরের স্টেপ কী?"

"ওটা সিক্রেট থাক। দরকার মতো আমি ফিডব্যাক দেব। আপনাদের আশপাশের ঘটনাপ্রবাহে সামান্য কোনও অস্বাভাবিকতা লক্ষ করলেই আমাকে জানাবেন।"

ঝিনুকরা গেটের কাছে এসে পড়েছে। সঙ্গে আছেন সুনেত্রাদি। দীপকাকু গেট খোলার সময় জিজ্ঞেস করলেন, "পল্লব ঘোষের নিশ্চয়ই এ বাড়িতে যাতায়াত ছিল?"

ভাইটাল কোয়েশ্চেন, একদম শেষ মুহূর্তে। ঝিনুক জানে, এটাই দীপকাকুর ধরন। জরুরি প্রশ্ন সাধারণ ভাবে, অসতর্ক অবস্থায় করা। এতে সত্যিটা সহজে বেরিয়ে আসে। সুনেত্রাদি উত্তর দিলেন, "আমার বিয়ের পর দু'বার বোধ হয় এসেছিল। ওদের সম্পর্কটা তখন ভালই ছিল। বিয়ের আগে কেমন আসা-যাওয়া ছিল, বলতে পারব না।"

বাইকের কাছে পৌঁছে গিয়েছেন দীপকাকু। ঝিনুকও আছে, বুঝতে পারছে না, দীপকাকুর সঙ্গে যাবে নাকি গাড়িতে ফিরবে। সুনেত্রাদি রাস্তায় চলে এসেছেন এগিয়ে দিতে। বাইক থেকে হেলমেট খুলে নিয়ে পার্কের দিকে তাকিয়ে রইলেন দীপকাকু। কী দেখছেন, বোঝা গেল একটু পরে। সুনেত্রাদিকে বললেন, "পার্ক দিয়ে তো অনেক লোক চলাচল করে দেখছি।"

"হ্যাঁ, দিনের বেলা লোকে বাসস্ট্যান্ডে যায় শর্টকাটে। রাতে আলো থাকে না, তখন ঘুরেই যেতে হয়।" সুনেত্রাদির কথা শুনে নিয়ে বাইকে বসলেন দীপকাকু। ঝিনুককে বললেন, "তুমি গাড়িতে বাড়ি ফিরে যাও।"

ঝিনুকের এতটুকু ইচ্ছে নেই দীপকাকুর সঙ্গ ছাড়ার। এতক্ষণ কথাবার্তার পর কেসটার ব্যাপারে উনি কী ধরনের ভাবনাচিন্তা করছেন, জানতে আগ্রহ হচ্ছে খুব। দীপকাকু সুনেত্রাদির দিকে তাকিয়ে বললেন, "ডোনেশানটা আপনি পিসিদিদার সংস্থাতেই দেবেন, তাই না?"

বাক্যহারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সুনেত্রাদি। হেলমেট পরে বাইক স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেলেন দীপকাকু।

॥ ৫ ॥

পরের দিন তদন্তের কাজে ঝিনুককে ডাকেননি দীপকাকু, আজ ডেকেছেন। গতকাল রাতের দিকে ফোন করে বলেছিলেন, "বেলা এগারোটা নাগাদ আমার অফিসে চলে এসো। একটা জায়গায় যেতে হবে।"

দীপকাকুর অফিসে আসার জন্য আজ যখন রেডি হচ্ছিল ঝিনুক, বাবা বললেন, "চ', আমিও অফিস যাওয়ার পথে একবার ঢুঁ মারি।"

দ্বিতীয়বার সুনেত্রাদির বাড়ি ঘুরে যাওয়ার পর বাবাকে সমস্তটাই রিপোর্ট করেছে ঝিনুক। বাবার ধারণা, কেস প্রায় সল্‌ভ হয়ে এসেছে।

ঝিনুক, বাবা বসে আছেন ভিজিটর্স এরিয়ার সোফায়। কাচঘেরা কেবিনে দীপকাকু এখন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত। ঝিনুকদের অফিসে ঢুকতে দেখে হাতের ইশারায় বাইরে বসতে বলেছেন। মিনিট পনেরো হতে চলল। বাবা উসখুস করছেন। ঝিনুক বাবাকে ব্যস্ত রাখার জন্য বলে, "দীপকাকুর এজেন্সির নামটা এবার বদলানো উচিত, 'বাগচী ডিটেকটিভ এজেন্সি'? এটা কোনও নাম হল! এই অফিসের সঙ্গে মানায়? রেনোভেট করার আগে নামের সঙ্গে অফিসের মিল ছিল। তখন তো একটা গুহার মতো লাগত।"

বাবার দিক থেকে কোনও উত্তর এল না। মেঝেয় রাখা পায়ের উপর পা রেখে দুলিয়ে যাচ্ছেন।

"নামে কী আসে-যায়!" হঠাৎ বলে উঠলেন বাবা। ঝিনুক ফিরে তাকায়। ফের বাবা বললেন, "ব্যবহারটাই আসল। এতক্ষণ ধরে বসে আছি, এক কাপ চায়েরও ব্যবস্থা নেই!"

বাবার মেজাজ চড়ছে। সেটাই স্বাভাবিক। পূর্ণ উদ্যমে কেসটা নিয়ে আলোচনা করতে এসে এভাবে বাইরে বসে থাকতে হলে রাগ তো হবেই।

দীপকাকুর একমাত্র স্টাফ সুদর্শনকাকাকে এখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি। এটাও একটু অস্বাভাবিক ঠেকছে। সুদর্শনকাকা সারাক্ষণ অফিস আগলায়। দীপকাকুর কাজ তো বেশিরভাগই বাইরে-বাইরে। সুদর্শনকাকা থাকলে বাবার চা এতক্ষণে এসে যেত। নির্দেশ পর্যন্ত দিতে হত না।

কেবিনের ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। নড়েচড়ে বসল ঝিনুক। বাবা আড়চোখে কেবিনের দিকে তাকিয়ে গুম হয়ে বসে রইলেন। দীপকাকুর সঙ্গে হ্যান্ডশেক সেরে দরজা টেনে বেরিয়ে এলেন ভদ্রলোক, সম্ভ্রান্ত শ্রেণির, পয়সাওলা চেহারা, ষাটের আশপাশে বয়স।

"কী ব্যাপার, আপনাদের চা দেয়নি এখনও?" বললেন দীপকাকু। কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছেন। ভিজিটর্স সোফায় বসতে-বসতেই নিজেকে শুধরে নিলেন, "ও হোঃ, সুদর্শন তো একটা অ্যাসাইমেন্টে আছে।"

ঝিনুক অবাক, সুদর্শনকাকাও দীপকাকুকে অ্যাসিস্ট করতে শুরু করেছে! ঝিনুকের প্রয়োজন তো এবার ক্রমশ কমে আসবে।

"দাঁড়ান, আমি নীচ থেকে চা আনিয়ে নিচ্ছি," বলে ফোন বের করে দু' কাপ স্পেশ্যাল চায়ের অর্ডার দিলেন দীপকাকু। ঝিনুক আর এক ধাপ হতাশ হয়, এভাবে ফোনে চা এসে গেলে সুদর্শনকাকা তো ফ্রি হয়ে যাবেই। বাইরের অনেক কাজ করানো যাবে তাকে দিয়ে।

"ভদ্রলোক কে? ক্লায়েন্ট? বেশ শাঁসালো পার্টি মনে হচ্ছে। প্রাইভেটলি অনেকক্ষণ সময় দিলে দেখলাম," অভিমান থেকেই খোঁচাটা দিলেন বাবা।

দীপকাকু বললেন, "ক্লায়েন্ট তো বটেই। উনি একটু প্রাইভেসিও চান। একটা ইমোশনাল ম্যাটার। কিন্তু কাজটা আমি কতটা করে উঠতে পারব, জানি না। তবে ওঁকে আমার খুব কাজে লাগছে। সমৃদ্ধ হচ্ছি খুবই।"

"বুঝলাম না," বললেন বাবা।

দীপকাকু বিশদে গেলেন, "ভদ্রলোকের নাম সমরেশ রায়। বিখ্যাত আর্কিওলজিস্ট। বিদেশেই বছরের বেশিরভাগ সময় থাকেন। বিভিন্ন

দেশের সরকারি মিউজিয়ামগুলোর একজন অন্যতম উপদেষ্টা।"

"ওরে বাবা, তার মানে তো বিগ শট! ওই লেভেলের লোক যখন তোমায় ইনভেস্টিগেশনের দায়িত্ব দিচ্ছে, কাজটাও যেমন কঠিন, চার্জও ইচ্ছেমতো হাঁকতে পারবে।"

মাথা নেড়ে অসমর্থনের হাসি হাসেন দীপকাকু। চা নিয়ে ঢুকল দোকানের ছেলে। গ্লাস তুলে নিলেন বাবা, দীপকাকু।

"মণিময়দের কেসটার ব্যাপারে কতদূর কী এগোল? মনে হচ্ছে মেরেই এনেছ," প্রসঙ্গে ফিরলেন বাবা।

"কীভাবে ধরছেন মেরে এনেছি?"

"ঝিনুকের থেকে যা শুনলাম, বোঝাই যাচ্ছে সুনেত্রার গয়নাগুলোই টার্গেট। চুরি করার চক্রান্ত করা হচ্ছে।"

"কে করছে? সে কী করে জানছে, সুনেত্রা কবে বাবাকে লকার থেকে গয়নাগুলো বের করে দেওয়ার কথা বলবে? সুনেত্রা আমাদের বলেছে, এখনই ডোনেট করার কথা সে ভাবছে না। আমরা ধরে নিলাম, এক বছর কিংবা তারও কম ছ' মাসের মধ্যে পিসিদিদার সংস্থায় টাকা দেবে সুনেত্রা। দুর্বৃত্ত এখন থেকে ঘুরঘুর করছে কেন?"

প্রশ্নটা কঠিন হয়ে গেল। উত্তর দিতে বাবা একবার ঢোক গিললেন। একটু গুছিয়ে নিয়ে বললেন, "হয়তো খুব ঘনিষ্ঠ এক-দু'জনকে বলেছে।"

"এমন কে-কে হতে পারে?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

বাবা বললেন, "মণিময়কে বলতে পারে। তারপর নিজের বাবা, মা। এ ছাড়া, অন্য কেউ হতে পারে, যার অস্তিত্ব এখনও আমরা টের পাইনি।"

"হাতে গোনা দু'-তিনজন যদি জানে, চুরি হলে সহজেই চোরকে শনাক্ত করা যাবে। সেই ঝুঁকিটা কি চোর নেবে?"

"সে তো নিজে চুরি করবে না। মণিময়দার ডুপ্লিকেটকে দিয়ে করাবে," নিজের মতামত রাখল ঝিনুক।

দীপকাকু বললেন, "তাতেও খুব একটা সুবিধে হবে না। তদন্তকারী যদি জেনে যায়, সন্দেহভাজন এই তিনজন, কাজটা তার কাছে অনেক সহজ হয়ে যাবে।

"ধরা যাক, যে ঘনিষ্ঠ তিনজন ওই ডোনেট করার দিনটা জানে, তাদের অসতর্কতায় ইনফরমেশনটা লিক হয়ে গিয়েছে। অথবা সুনেত্রা যখন তিনজনের কোনও একজনকে পরিকল্পনাটা জানাচ্ছিল, কেউ ওভারহিয়ার করেছে। সে নিজে কিংবা তার থেকে শুনে অন্য কেউ নেমে পড়েছে চুরির চক্রান্তে।"

"ভেরি গুড!" বাবার অ্যানালিসিসে যেন খুশি হলেন দীপকাকু। পরক্ষণেই বললেন, "তা হলে সন্দেহভাজন কতজন দাঁড়াল? তিন থেকে বেড়ে তিরিশ, কী তারও বেশি। এতে কি প্রমাণ হয় কেসটা মেরে এনেছি?"

বাবা, ঝিনুক দু'জনেই চুপ। উত্তর আসছে না মাথায়। ফের দীপকাকুই বলা শুরু করলেন, "আন্দাজমতো উত্তর ধরে নিয়ে অঙ্ক কষার চেয়ে অঙ্ক কষে উত্তরে পৌঁছনো ভাল। আমি এখন সেই রাস্তা ধরে এগোচ্ছি। আমার হিসেব বলছে, সাধারণ চুরি-ডাকাতির কেস এটা নয়। সেক্ষেত্রে দুর্বৃত্ত নিজের উপস্থিতি এভাবে জানান দিত না। সময় মতো নিজের কাজটি সেরে পালিয়ে যেত। যে অপরাধটি ঘটতে চলেছে, তার জন্য এই প্ল্যানটা দুর্বৃত্তর কাছে অপরিহার্য। অনেক ভাবনাচিন্তা করে ছকটা সে সাজিয়েছে। যারা এই ঘটনাটা লক্ষ করছে, তাদের কনফিউজ করে দিতে চাইছে সে। দোকান থেকে জিনিস

কিনে পার্স ভোলার ভান করছে, যখনই তার উপর সন্দেহ পড়ল, টাকাটা মিটিয়ে দিল। মণিময়দের বাড়িটা সে অন্য সময় আড়াল থেকে লক্ষ করতে পারত। যে-কোনও শিক্ষানবিশ দুষ্কৃতীই এটা করবে। মণিময়দের বাড়ি লক্ষ করাটা আসলে অছিলা। চোখে পড়ার জন্যই সে সুনেত্রার স্কুলে বেরনোর সময়টা বেছে নেয়। সুনেত্রাকে এগিয়ে আসতে দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাওয়াটাও ছিল অ্যাকটিং। এই যে দু' বার দু' ধরনের আচরণ, এটাই ধন্দ তৈরি করার প্রয়াস। এর ফাঁকে হঠাৎ একসময় নিজের দাঁওটা মেরে চলে যাবে সে," থামলেন দীপকাকু। একটানা কথা বলে দম নিচ্ছেন।

ঝিনুক জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, "দাঁওটা কী ধরনের?" করে না। দীপকাকু তো আর জ্যোতিষী নন। জ্যোতিষী শব্দটা মাথায় আসতে একটা জরুরি প্রশ্ন মনে পড়ে গেল ঝিনুকের, দীপকাকুর উদ্দেশে বলল, "একটা অন্য ব্যাপার জানতে চাইছি। পিসিদিদা যে বেঁচে আছেন, আপনি কী করে জানলেন? সেই দিনই তো প্রথম সুনেত্রাদির পিসিদিদার কথাটা উঠল।"

"আগেও উঠেছে। মাথায় রাখোনি," একটু থেমে দীপকাকু ফের বললেন, "পিসিদিদা, যিনি সম্পর্কে সুনেত্রার পিসিঠাকুরমা, তাঁর কথা জানি প্রথমে পল্লব ঘোষের কাছে। বলেছিল, মণিময় নিজের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ কমিয়ে দিলেও, বড়লোক শ্বশুরবাড়ি, এমনকী, সুনেত্রার পিসিঠাকুরমারও কেয়ার নেয়। অবশ্য যে সময়ের কথা বলছিল পল্লব ঘোষ, এর মাঝে বীণাপাণি গুপ্ত মারা যেতেই পারতেন। বয়স হল নব্বইয়ের দোরগোড়ায়। ওঁর সম্বন্ধে বলার সময় সুনেত্রার মুখে যে উচ্ছ্বাস দেখেছি, উনি সদ্য গত হলে এতটা থাকত না। ওঁর প্রসঙ্গে বিষণ্ণ দেখাত সুনেত্রাকে।"

পিসিঠাকুরমার নাম জোগাড় করে ফেলেছেন দীপকাকু। ওঁর সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আরও অনেক তথ্যই এখন তাঁর জিম্মায়। ঝিনুকের অজ্ঞাতে তদন্ত কিন্তু চালু রয়েছে।

বাবা বলে উঠলেন, "আচ্ছা, ঠিক কিসের ভিত্তিতে ডুপ্লিকেটকে আমরা অসৎ লোক বলে ধরে নিচ্ছি? হতেই পারে, সে ও পাড়ায় নতুন এসেছে। তাকেও লোকজন বলছে, সে মণিময়ের মতো দেখতে। মণিময় কোথায় থাকে, জানার আগ্রহ হয়েছিল তার। পাড়ারই কেউ মণিময়ের ঠিকানা দিয়েছিল, দূর থেকে দাঁড়িয়ে বাড়িটা দেখছিল বেচারা। সুনেত্রার এগিয়ে আসাটা সত্যিই এত অ্যাগ্রেসিভ ছিল, বাস্তবিকই ভয় পেয়ে যায় লোকটা। দোকানদারের সঙ্গেও সে কোনও প্রতারণা করেনি। তার অপরাধ মাত্র দু'টো, মণিময়ের মতো দেখতে হওয়া আর ওদের পাড়ায় থাকতে শুরু করা।"

রিস্টের ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে দীপকাকু বললেন, "দু'টো ঘটনাই দোষের নয়। একসঙ্গে ঘটাটাই আশ্চর্যের। একটা সমাপতন মানা যায়, পাশাপাশি আর একটা হলেই সন্দেহ জাগে। এ ছাড়াও, এই ঘটনায় এমন কিছু সূক্ষ্ম, তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার আমার চোখে পড়েছে, যার থেকে সন্দেহ ক্রমশ গাঢ় হয়।"

"সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো কি আমরা বুঝতে পারব?" কপট বিনয়ে বললেন বাবা। ঘুরিয়ে কথা বের করতে চাইছেন।

কোনও লাভ হল না। দীপকাকু বললেন, "আমার পর্যবেক্ষণে গলদও থেকে যেতে পারে। কয়েকটা বিষয়ে শিওর না হয়ে কোনও মন্তব্য করা ঠিক হবে না। যেমন, আর খানিকক্ষণের মধ্যেই আমরা জেনে যাব, লোকটা ও পাড়ায় থাকে কিনা?"

ঝিনুক ভিতর-ভিতর চমকায়। একই সঙ্গে বেশ রাগও হয়। তদন্তের একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ পেরোতে চলেছেন দীপকাকু, ঝিনুককে কিছুই জানানো হয়নি। সে শুধু ফলাফল জানবে। অ্যাসিস্ট্যান্টের প্রতি এই আচরণ মোটেই অভিপ্রেত নয়। দীপকাকু ফের রিস্টওয়াচ দেখলেন, মুখ তুলে দরজার দিকে তাকালেন। তার মানে খবর ফোনে নয়, কেউ পায়ে হেঁটে নিয়ে আসবে। তারপর ঝিনুকরা কোথাও একটা যাবে। হয়তো খবরটার উপরই নির্ভর করছে যাওয়াটা।

কিছু একটা মনে পড়াতে দীপকাকুর মুখে হঠাৎই খুশির আভা দেখা দিল। একগাল হেসে ঝিনুককে বললেন, "সুনেত্রা কোথায় দান করবে, কেমন বলে দিলাম! ঘটনাটা বলেছ রজতদাকে?"

"বলেছি," বলে চুপ করে গেল ঝিনুক।

বাবা উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন, "ও হ্যাঁ, শুনেছি। তুমি একেবারে চমকে দিয়েছ সুনেত্রাকে! কীভাবে আন্দাজ করলে বলো তো?"

দীপকাকু বলতে থাকলেন। ঝিনুকের শোনার কোনও আগ্রহ নেই। দীপকাকুর বুদ্ধির তুলনায় ওই স্টান্টটা ছিল খুবই মামুলি। একদিন সময় পেলে ঝিনুকও বের করে ফেলতে পারত, টাকা কোথায় ডোনেট করা হবে। সুনেত্রাদি অবশ্য খুব চমকেছেন। দীপকাকুর বাইক দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়ার পর ঝিনুককে বলেছিলেন, "তোমার কাকু তো মারাত্মক ইন্টেলিজেন্ট। চেহারা দেখলে বোঝা যায় না। একেবারেই ভোলেভালা গোছের মনে হয়।"

পরশু সুনেত্রাদি দীপকাকুর ফোন নম্বর ঝিনুকের থেকে নিয়েছেন। বলেছেন, "বারবার তোমার ভায়া হয়ে খবর পৌঁছতে হচ্ছে। কোনও সময় তোমাকে যদি পাওয়া না যায়, সমস্যায় পড়ে যাব।"

নম্বর দিতেই হয়েছে ঝিনুককে, কোন যুক্তিতে না বলবে। আশঙ্কা হচ্ছিল একটাই, সুনেত্রাদি তো এবার ডাইরেক্ট ফোন করবেন দীপকাকুকে। সেরকম আর্জেন্ট ব্যাপার হলে, দীপকাকুর হয়তো ঝিনুককে ডাকার কথা মনেই পড়বে না। তদন্তের সক্রিয় অংশ থেকে বঞ্চিত হবে ঝিনুক। এখন যে খবরটা আসবে, সেটা হয়তো তেমনই কিছু... ভাবনা থমকে গেল দরজার দিকে চোখ যেতে, সুদর্শনকাকা ঢুকে আসছে। বেশ কাহিল চেহারা। হাতে ঝুলছে ফিতে দেওয়া আইডেন্টিটি কার্ড। গলায় ঝোলানোর জন্য ওই ফিতে।

সুদর্শনকাকার পিছন-পিছন আর একজনও ঘরে ঢুকে এল। ট্যাক্সি ড্রাইভার। ড্রেস তাই বলছে। সুদর্শনকাকা কার্ডটা দীপকাকুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "না, আর কেউ নেই। পাড়ার লোক ওই একজনেরই নাম করছে।"

কার্ড এখন দীপকাকুর কাছে। ঝিনুক হাত বাড়িয়ে নেয়। ফোটোর দিকে চোখ পড়তেই ভীষণ অবাক হয়, মণিময়দার ফোটো! নাম কিন্তু অন্য লোকের, শুভ্রজিৎ বসাক। সিনিয়র অফিসার। সেনেট প্রাইভেট লিমিটেড। মুম্বইয়ের ঠিকানা। তা হলে কি এই সেই ডুপ্লিকেট? দীপকাকু এর কার্ড পেলেন কীভাবে? প্রশ্নগুলো আপাতত পাশে রেখে দীপকাকুর কথায় মন দেয় ঝিনুক, সুদর্শনকাকাকে বলছেন, "গোটা ওয়ার্ড ঘুরে খুঁজেছ তো? কোনও গ্যাপ থেকে যায়নি?"

"গ্যাপ ছিল। আপনি যেরকম বলেছিলেন। চার বাড়ি অন্তর। প্রত্যেকে মণিময় মুখার্জির কথাই বলছে। এক-দু'জন ওদের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিল। নাম দেখিয়ে ক্ষান্ত করি। বলি, ওঁর নাম মণিময়। ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি," বলল সুদর্শনকাকা।

দীপকাকু জানতে চাইলেন, "ওদের বাড়ির খুব কাছাকাছি চলে যাওনি তো?"

"না, আপনি তো বারণ করেছিলেন।"

সুদর্শনকাকার উত্তর শুনে নিয়ে দীপকাকু ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কত বিল হয়েছে ভাই?"

"ছ'শো তিরিশ টাকা," বলল ড্রাইভার।

প্যান্টের পকেট থেকে পার্স বের করলেন দীপকাকু। একটা পাঁচশোর, তিনটে একশোর নোট দিলেন ড্রাইভারকে। বললেন, "এক্সট্রাটা তোমার অ্যাকটিং-এর জন্য।"

ঝিনুক অবাক, ড্রাইভারকে আবার অ্যাকটিং করতে হচ্ছে কেন? টাকাগুলো কপালে ঠেকিয়ে ড্রাইভার বলল, "যখনই দরকার পড়বে, ডাকবেন স্যার।"

হেসে ঘাড় হেলালেন দীপকাকু। দরজার দিকে এগিয়ে গেল লোকটা। সুদর্শনকাকাও এখন আর সামনে নেই। কখন যেন সরে গিয়েছে। বাবা ঝিনুকের থেকে কার্ডটা নিয়ে ভাল করে দেখলেন। সবিস্ময়ে দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কে এই লোকটা? সেই ডুপ্লিকেট?"

"গেস করুন," বলে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন দীপকাকু। তার

মানেই ব্যাপারটার মধ্যে কোনও মজা বা ট্রিক লুকিয়ে আছে। কী সেটা? গভীর ভাবে ভাবতে থাকে ঝিনুক। বাবাও চিবুকে হাত রেখে ফোটোটার দিকে চেয়ে আছেন। একটু পরে বলে উঠলেন, "মনে হচ্ছে প্রেসের মিসটেক এটা। মণিময় যেখানে কার্ড ছাপতে দিয়েছিল, তারাই অন্য কারও কার্ডে ফোটোটা ছেপে ফেলেছে।"

"হল না। তবে আপনার ইমাজিনেশনের তারিফ করতেই হবে রজতদা," মুখে হাসি বজায় রেখে বললেন দীপকাকু।

ঝিনুকও জানে, বাবার কল্পনাশক্তি সাংঘাতিক! দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেয়ে সেই ক্ষমতা ব্যবহার করেন অহরহ। কাল্পনিক উপায়ে রহস্যভেদ কখনওই সম্ভব নয়। কল্পনা আর যুক্তিকে পাশাপাশি নিয়ে এগোতে হয়। বাবার থেকে কার্ড ফেরত নিয়ে ফোটোতে চোখ রেখে ঝিনুক বলল, "প্রিন্টিং প্রেসের এরকম ভুল হওয়া সম্ভব। দীপকাকুর পক্ষে এই ভুল ছাপা কার্ডও জোগাড় করা কঠিন নয়।"

দীপকাকুর মুখ থেকে হাসি উধাও। জিজ্ঞেস করলেন, "কী করে?"

উত্তরে ঝিনুক বলল, "মণিময়দার বাবার একসময় প্রিন্টিং প্রেস ছিল আমরা জানি। সেখানে ইতিমধ্যে আপনি হানা দিয়েছেন। লাকিলি, এই ভুল কার্ডটা আপনার হাতে এসে গিয়েছে।"

"ভেরি গুড!" বললেন দীপকাকু।

উৎসাহ পেয়ে ঝিনুক বাড়তি উদ্যমে বলতে থাকে, "মণিময়দার ডুপ্লিকেট ও পাড়ায় থাকে কিনা, নিশ্চিত হওয়ার জন্য আপনি সুদর্শনকাকাকে কার্ডটা দিয়ে র‍্যানডাম সার্ভে করতে পাঠিয়েছিলেন। সব বাড়িতে যাওয়ার দরকার নেই, কিছু বাড়ি অন্তর খোঁজ নিলেই হবে। প্রত্যেক বাসিন্দাই তার আশপাশের মানুষদের চেনে। ফ্ল্যাটবাড়িতে আরও সুবিধে, কেয়ারটেকারকে ফোটো দেখালেই চলবে," থামল ঝিনুক। বাবা, দীপকাকু দু'জনেই তারিফের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। এবার ঝিনুক তার আসল কথায় এল। বলল, "এত কিছুর পরও আমার মনে হচ্ছে ফোটোটা মণিময়দার নয়।"

"কেন?" জানতে চাইলেন বাবা।

ঝিনুক বলল, "মণিময়দা চশমা পরেন, ফোটোয় নেই। লোকটার বয়স মণিময়দার চেয়ে কম মনে হচ্ছে।"

দীপকাকু বললেন, "কার্ডটা জাল। আমিও বানিয়েছি।"

"মানে?" আক্ষরিক অর্থে চমকে উঠে বললেন বাবা। ঝিনুকও কিছু কম অবাক হয়নি। অভিব্যক্তিতে তার ছাপ পড়তে দেয় না। ভ্রু দু'টো সামান্য কুঁচকে দীপকাকুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

"সুনেত্রাদের বাড়িতে ফোটো অ্যালবাম দেখার সময় মণিময়ের একটা হাফ বাস্ট ফোটো আমি হাত সাফাই করি। সেটাই স্ক্যান করে কম্পিউটারে তৈরি করি একটা ফলস আইডেন্টিটি কার্ড। তখনই টুল্‌স দিয়ে চশমাটা ভ্যানিশ করে দিই। কারণ, গ্রোসারি শপের মালিক আমাদের বলেছিল, লোকটার চশমা ছিল না। ফোটোটা বেশ কয়েক বছর আগের। সেই জন্যেই মণিময়ের থেকে অল্পবয়স্ক মনে হচ্ছে। অফিসিয়াল কোনও কাজে হয়তো পাসপোর্ট সাইজের ফোটো তুলিয়েছিল। ফোটোটা ভাল হয়ে যাওয়ায় মণিময়রা চার বাই ছয় সাইজের প্রিন্ট করিয়ে অ্যালবামে রেখেছিল।"

"অল্প বয়সের ফোটো বাছার কারণ?" প্রশ্ন করলেন বাবা।

দীপকাকু বললেন, "আমি চেয়েছিলাম মণিময়ের মতো একটা ফোটো। মণিময়ের এখনকার ফোটো হলে, কার্ডে যারই নাম থাকুক, পাড়ার লোক সুদর্শনদাকে মণিময়ের বাড়িতে জোর করে নিয়ে যেত। এই ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা নেই। সুদর্শনদার বলার স্কোপ রইল, 'মণিময়বাবুকে আমরা দেখেছি, চশমা আছে। বয়সও একটু বেশি।' আমি বলে দিয়েছিলাম পরিস্থিতি তেমন হলে এই ডায়ালগটা বলতে," দম নিতে থামলেন দীপকাকু। এই ফাঁকে ঝিনুক বলে, "ওপাড়ায় মণিময়দার মতো দেখতে আর কেউ আছে কিনা জানতেই অপারেশনটা আপনি চালিয়েছেন। সুদর্শনকাকা কী অজুহাত নিয়ে লোকের বাড়িতে ফোটোটা দেখাল?"

ছোট্ট করে হেসে নিয়ে দীপকাকু বললেন, "সুদর্শনদা ছিল ট্যাক্সির মালিকের ভূমিকায়। সঙ্গে সত্যিকারের ট্যাক্সি ড্রাইভার। তাকেও অবশ্য অ্যাকটিং সার্পোট দিতে হয়েছে। সুদর্শনদার সব কথায় "হ্যাঁ" বলে গিয়েছে নিরীহ মুখে। ফল্‌স আই কার্ডটা বাড়ির লোকদের দেখিয়ে সুদর্শনদা বলেছে, 'ফোটোর এই ভদ্রলোক আমার ট্যাক্সি থেকে এ পাড়ায় নামেন গতকাল। কার্ডটা ভুল করে ফেলে যান। সিটের সাইডে ঢুকে ছিল। রাতে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আসার পর আমি চেক করতে গিয়ে কার্ডটা পাই। কেউ যদি ভদ্রলোকের সন্ধান দিতে পারেন, হাতে-হাতে দিয়ে দেওয়া যায়। নয়তো থানায় জমা করে দেব। ভদ্রলোকের হয়রানি হবে ফেরত পেতে।'"

দীপকাকু থামতেই বাবা বলে উঠলেন, "ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া। এ শুধু তোমার পক্ষেই সম্ভব।"

"কিন্তু আলটিমেটলি ব্যাপারটা কী দাঁড়াল?" ভ্রু নাচিয়ে প্রশ্নটা রাখলেন দীপকাকু।

উত্তরে ঝিনুক বলল, "মণিময়দার ডুপ্লিকেট ও পাড়ায় থাকে না। বাইরে থেকে আসছে।"

কথার সূত্র ধরে দীপকাকু বললেন, "অথচ ভান করছে মণিময়দের পাড়ায় আছে। পাড়ার ইলেকট্রিশিয়ানকে বলছে, ফ্রিজ সারিয়ে আসতে। লোকাল কাঁচাবাজার থেকে জিনিস কিনছে সকালে। মুদিখানায় যাচ্ছে সাধারণ পাজামা-পাঞ্জাবি পরে, যাতে দেখে মনে হয় বাড়ি কাছেই অর্থাৎ কোনও একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এলাকায় আসছে লোকটা।"

সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বাবা বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছিলে, কিছু একটা ঘটতে চলেছে। কিন্তু কী ঘটতে পারে, তার কি কোনও আভাস পাচ্ছ?"

"না। এ ব্যাপারে এখনও আমি অন্ধকারে। আরও কয়েকটা জায়গায় ভিজিট দিতে হবে। যেমন, এখন আমি আর ঝিনুক যাব বীণাপাণি গুপ্তর 'অমল আলো' নামের প্রতিষ্ঠানে," বললেন দীপকাকু।

ঝিনুকের আন্দাজ সঠিক। পিসিদিদার ব্যাপারে যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করে নিয়েছেন দীপকাকু। সংস্থার নামটা বলে দিলেন। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বাবা। বললেন, "আমারও ইচ্ছে হচ্ছে তোমার সঙ্গে যাওয়ার। কেসের কারণে শুধু নয়, ওই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মও দেখতে আগ্রহ হচ্ছে খুব। এই বয়সে এসেও ওরকম একটা মহৎ উদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছেন বৃদ্ধা, ভাবাই যায় না! ভীষণ ইমপর্ট্যান্ট একটা মিটিং আছে অফিসে। নয়তো ঠিক যেতাম।"

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বাবার সেলফোন বেজে উঠল। সেট কানে নিয়ে কথা বলতে-বলতে বেরিয়ে গেলেন বাবা। দীপকাকু ঝিনুককে বললেন, "চলো, যাওয়া যাক।"

॥ ৬ ॥

গোবরা অঞ্চলে আগে কখনও আসেনি ঝিনুক। মৌলালি মোড় থেকে দশ মিনিটের দূরত্বও নয়, শহরের কাঠিন্য এখানে একেবারেই আলগা হয়ে গিয়েছে। আসার পথে গোটা তিনেক পুকুর চোখে পড়ল, অনেক গাছপালা। অমল আলোর বিল্ডিং ছোটখাটো প্রাসাদ। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা জায়গাটা। ঢোকার মুখে দেড় মানুষ উঁচু লোহার গেট। নির্দিষ্ট ড্রেস পরা সিকিউরিটি ম্যান আছে। দীপকাকুর পরিচয় জানতে চেয়েছিল সে। দীপকাকু বললেন, "একটা এন জি ও থেকে এসেছি। মামণির সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

'মামণি' নিশ্চয়ই বীণাপাণি গুপ্ত, ঝিনুকের মাথায় অ্যাড হল আর একটা ইনফরমেশন। পরে নোটবুকে যাবে। সিকিউরিটি ম্যান সেলফোন বের করে ঝিনুকদের আসার খবরটা ভিতরে চালান করেছিল। ফোনসেট কান থেকে নামিয়ে বলেছিল, "অফিসে গিয়ে বসুন। মামণি একটু পরেই নামবেন।"

অর্থাৎ বীণাপাণিদেবী দোতলায় থাকেন। দরোয়ানের খুলে দেওয়া গেট দিয়ে ঢুকে ঝিনুক দেখেছিল, অনেক জায়গা জুড়ে একতলাটা। স্টুডেন্টরা সম্ভবত এখানেই থাকে। এখন নিস্তব্ধ। সকলেই স্কুলে গিয়েছে। মোরাম বিছানো রাস্তার পাশে গার্ডেনিং করা। ছোট মতো একটা মাঠও চোখে পড়ল। দরজার উপর 'অফিস' লেখা ঘরটায়

ঢুকেছিল ঝিনুকরা। বছর তিরিশের এক মহিলা বিশাল সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের একপাশে বসে ফাইল দেখছিলেন। ঝিনুকদের আসার খবর ওঁর কাছে পৌঁছেছে। দীপকাকুকে বললেন, "বসুন। মামণি এসে কথা বলবেন।"

ফাইল হাতে নিয়ে সেই যে গেলেন মহিলা, দশ মিনিট হতে চলল এই ঘরে আর কেউ আসেনি। টেবিলের মূল চেয়ারের ঠিক পিছনে দেওয়ালে টাঙানো বয়স্ক এক মানুষের প্রতিকৃতি। আবক্ষ। আঁকা নয়, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ফোটোগ্রাফ। ঘরে চারটে বইঠাসা আলমারি। দীপকাকু আবক্ষ ফোটোটার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। খুব বিরক্ত লাগছে ঝিনুকের। বাইরে থেকে ভেসে আসছে শালিক, চড়াইয়ের ডাক।

দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকায় ঝিনুক। যাঁকে দেখল, বলে দেওয়ার দরকার নেই, ইনিই বীণাপাণি গুপ্ত।

দীপকাকুও টের পেয়েছেন ওঁর উপস্থিতি, চেয়ার থেকে উঠে হাতজোড় করে বললেন, "নমস্কার।"

হাতের ইশারাসহ বীণাপাণি বললেন, "বসুন-বসুন।"

ঝিনুকও উঠে দাঁড়িয়েছিল, দীপকাকুর দেখাদেখি বসল চেয়ারে। টেবিলের ওপ্রান্তে মাঝের চেয়ারে গিয়ে বসলেন বীণাপাণি গুপ্ত। মনেই হচ্ছে না, নব্বইয়ের আশপাশে বয়স। বড়জোড় সত্তর লাগছে। খুব ফরসা, অভিজাত চেহারা। শাড়ি থেকে চশমার ফ্রেম, সবই বনেদিয়ানার সাক্ষ্য দিচ্ছে। দামি কোনও পারফিউম ইউজ করেছেন। মিষ্টি একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে। দীপকাকু ভিজিটিং কার্ড এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আমি দিল্লিতে থাকি। এখানে মামার বাড়িতে এসেছি।"

ঝিনুক লক্ষ করেছে কার্ডটা দীপকাকুর নয়। এটাও হয়তো তৈরি করেছেন। কার্ডটা পড়ে মুখ তুললেন সুনেত্রাদির পিসিদিদা। বললেন, "তা বলুন তন্ময়বাবু, আমি আপনার জন্য কী করতে পারি?"

দীপকাকু নাম বদলেছেন, বলে রাখা উচিত ছিল ঝিনুককে। এখন বীণাপাণিদেবীকে বললেন, "আপনি আমাকে 'তুমি' করে বলবেন। আমি সমীরের বন্ধু।"

"কে সমীর?" জানতে চাইলেন বীণাপাণিদেবী।

দীপকাকু বললেন, "সমীর মাইতি, আপনার এখানে থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েছে। এখন দিল্লিতে বিদেশি ব্যাঙ্কে চাকরি করে। সমীরই আমাকে আপনার এই প্রতিষ্ঠানের কথা বলেছে।"

বীণাপাণি গুপ্ত মনে করার চেষ্টা করছেন তাঁর পুরনো আবাসিক ছাত্রকে। ঝিনুক জানে, পড়বে না মনে। দীপকাকু একটা কমন নাম বেছে নিয়ে আলাপ এগনোর চান্স নিচ্ছেন।

চান্সটাই খেটে গেল। বীণাপাণি বলে উঠলেন, "ও মনে পড়েছে। সমীর, মানে একটু শ্যামলা মতো, রোগা চেহারা। খুব ছটফটে। জানি না এখন কেমন স্বভাব হয়েছে। কোনও যোগাযোগ রাখে না। চাকরি তো ভালই করে দেখছি।"

"যোগাযোগ করে উঠতে না পারলেও আপনাদের কিন্তু ভোলেনি। আমি মামারবাড়ি আসছি শুনে বারবার করে বলেছে, এখানে একবার ঘুরে যেতে। অমল আলোর জন্য যদি কিছু করা যায়।"

"কিছু করা যায় বলতে?" আগ্রহী কণ্ঠে জানতে চাইলেন বীণাপাণিদেবী।

দীপকাকু নড়েচড়ে বসে বলতে শুরু করলেন, "আমরা হচ্ছি বেসরকারি সেবাপ্রতিষ্ঠান, স্প্রাউট। বেশ নামী। কার্ডে ই-মেল অ্যাড্রেস আছে, ওয়েবসাইট খুললেই আমাদের কাজ সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়ে যাবে। খুব সম্প্রতি এডুকেশন ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা বেশ বড় অ্যামাউন্টের বিদেশি অনুদান পেতে চলেছি। সেই টাকা থেকে আপনাদের মতো কিছু সংস্থাকে সাহায্য করতে চাই।"

"এ তো খুব ভাল কথা। আমাদের কী করতে হবে?" উৎসাহভরে জানতে চাইলেন বীণাপাণি গুপ্ত।

দীপকাকু বললেন, "তেমন কিছু না, আপনাদের কাজ সম্বন্ধে ডিটেল জানিয়ে, গত তিন বছরের আয়ব্যয়ের হিসেব দিয়ে একটা অ্যাপ্লিকেশন করবেন। বাকিটা আমি দেখে নেব।"

"সেসব আমাদের রেডি করাই থাকে। প্রত্যেক বছর সরকার এবং অন্যান্য সংস্থার কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করি," বললেন বীণাপাণিদেবী।

দীপকাকু বললেন, "তা হলে তো কাজ অনেক কমে গেল। এবার অ্যাপ্লিকেশনে লিখতে হবে না, এমন কয়েকটা প্রশ্ন করি। উত্তরগুলো জানা থাকলে অফিসে সুপারিশ করতে আমার সুবিধে হবে।"

"বলো, কী জানতে চাও?" বলে গদিআঁটা রিভলভিং চেয়ারে ভাল ভাবে ঠেসান দিলেন সুনেত্রাদির পিসিদিদা।

দীপকাকু তখনই প্রশ্নে না গিয়ে ঝিনুককে বললেন, "ইনফরমেশনগুলো নোট কর মিলি।"

নিজের চরিত্রের নতুন নাম পেল ঝিনুক। নট ব্যাড। দীপকাকু আবার তুইতোকারিও করছেন। চরিত্রের ভূমিকাটা বোঝা যাচ্ছে না। নোটবুক, পেন বের করেছে ঝিনুক। বীণাপাণিদেবী ঝিনুককে দেখিয়ে দীপকাকুর কাছে জানতে চান, "ও কি তোমাদের এন জি ও-তেই আছে?"

"না-না, ও আমার বড়মামার মেয়ে। কলকাতাতেই থাকে। এন জি ও-র কাজগুলো শেখাচ্ছি।"

দীপকাকুর উত্তর শুনে খুশি হলেন বীণাপাণি। বললেন, "খুব ভাল। এই ধরনের ভাল কাজের সঙ্গে ছোট থেকেই জড়িয়ে থাকা উচিত। তুমি কী পড়াশোনা করছ এখন?"

শেষের বাক্যটা বললেন ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে। ঝিনুক নিজের কলেজের নাম, ইয়ার, সাবজেক্ট বলল।

"বাহ্, ভেরি গুড!" বললেন বীণাপাণিদেবী।

দীপকাকু এবার প্রশ্ন শুরু করলেন, "আপনি তো অমল আলো-র অধ্যক্ষ? ম্যানেজিং বডি আছে কোনও?"

"খাতায়-কলমে আছে। সব ডিসিশন আমাকেই নিতে হয়।"

"এই বাড়ি, জমির মালিক তো আপনি। আপনার পরে কে?"

"আমি নিঃসন্তান। কোনও ওয়ারিশন নেই। প্রপার্টির মালিকও এখন আর আমি নই। ট্রাস্টিকে দেওয়া আছে। ট্রাস্টির প্রেসিডেন্ট আমি। ট্রাস্টির মেম্বার এখানে যারা কাজ করে, তারাই। দু'জন শুধু বাইরের লোক রেখেছি, একজন ডাক্তার, অন্যজন উকিল।"

"আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কাউকে রাখেননি?"

"না। রাখলেই আমার অবর্তমানে আত্মীয়তার অধিকারবলে সে সকলের মাথার উপর উঠে বসত। প্রতিষ্ঠানটাকে আমি কোনওভাবেই পারিবারিক সম্পত্তি হতে দিতে চাই না।"

"ব্যস, এটুকু জানলেই আমার চলবে," বলার পর দীপকাকু আর একটু বেশি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "এবার সাধারণ কৌতূহল থেকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, আপনার পিছনে এই ফোটোটা কার? উনিই কি এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ?"

"উনি আমার বাবা। ঠিক প্রাণপুরুষ নন। অমল আলো দেখে যেতে পারেননি। উনি আমার অনুপ্রেরণা," বললেন বীণাপাণি।

দীপকাকুর কৌতূহল এটুকুতে মিটল না। বললেন, "ওঁর সম্বন্ধে আর একটু যদি কিছু বলেন।"

বড় করে শ্বাস নিয়ে বীণাপাণিদেবী বলতে শুরু করলেন, "আমার বাবা অম্বিকাচরণ কর ছিলেন বিদ্যোৎসাহী মানুষ। নিজে খুব মেধাবী ছিলেন। দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে ব্যারিস্টারি করার পর জজ হয়েছিলেন জেলা আদালতের। নিজের টাকায় বহু স্কুল-পাঠশালা খুলেছিলেন। বাবার আগ্রহেই সে যুগে আমি এম এ পাশ করি। তখন মহিলা এম এ পাশ হাতে গোনা। যদিও পড়াশোনা সেভাবে কোনও কাজে এল না আমার। বিয়ে হল সম্পন্ন পরিবারে। স্বামীও ব্যারিস্টার। সে যুগে ভদ্র বাড়ির মেয়ে-বউদের বাইরে চাকরি করতে যাওয়া ছিল অসম্মানের ব্যাপার। আমার নিজের সন্তান না থাকলেও ভাসুর, দেওরের অনেক ছেলেমেয়ে ছিল। তাদেরও পড়ানোর সুযোগ পেতাম না আমি। মাইনে করা মাস্টারমশাইরা এবেলা-ওবেলা পড়িয়ে যেতেন। আমি পড়ে থাকতাম ঘরকন্নার কাজ নিয়ে। তখন থেকেই মাথায় খেলত,

যদি কখনও সুযোগ পাই অভাবী ঘরের ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার জন্য কিছু করব।"

দীপকাকু বললেন, "সেই ভাবনার ফল হচ্ছে আপনার এই অমল আলো।"

উত্তরে নীরব থাকলেন বীণাপাণিদেবী। টেবিলে রাখা প্রাচীন আমলের ওলটানো বাটির মতো দেখতে কলিংবেলে দু'বার চাপড় মারলেন। কাউকে ডাকছেন। ঝিনুক পিছন ফেরে। দরজায় এসে দাঁড়ালেন অনুজ্জ্বল চেহারার এক মহিলা। বীণাপাণি তাঁকে বললেন, "রেবা, আমাদের তিন কাপ চা দিয়ো।"

"আমি না," প্রায় হাত তুলে বলে উঠল ঝিনুক।

বীণাপাণিদেবী মহিলাকে বললেন, "ঠিক আছে, দু' কাপ।"

মহিলা সরে গেলেন দরজা থেকে। নমনীয় ভঙ্গিতে দীপকাকু ফের কথা শুরু করলেন, "এই প্রপার্টির অনেকটা অংশ আপনি বাবার থেকে পেয়েছেন নিশ্চয়ই?"

"না। বাবার সম্পত্তির কিছুই আমি নিইনি। ছিলও না বেশি কিছু। জমি-বাড়ি, টাকাপয়সা দাদাকে দিয়ে আমি নিয়েছি বাবার সার্টিফিকেট, মেডেল, কৃতিত্বের সব স্মারক। অনেক পেয়েছেন জীবনে।"

বীণাপাণিদেবী থামতেই দীপকাকু বললেন, "এই সম্পত্তির সমস্তটাই তা হলে আপনার স্বামীর?"

"হ্যাঁ। ওঁর রোজগার ছিল বেশ ভাল। এই বাড়িটা বাগানবাড়ি হিসেবে বানিয়েছিলেন। মারা গেলেন মাত্র ষাট বছর বয়সে। তারপরই আমি এখানে চলে আসি। ওঁর রেখে যাওয়া টাকা দিয়ে শুরু করি অমল আলো।"

দু' কাপ চা নিয়ে ঢুকলেন রেবা। দীপকাকু আর বীণাপাণিদেবীর সামনে রেখে গেলেন। দীপকাকু আমেজ করে চুমুক দিলেন চায়ে। বললেন, "আপনার বাবার জীবনী নিয়ে কোনও বই আছে? পড়তে পারলে ভাল লাগত।"

বীণাপাণিদেবীও খাচ্ছিলেন চা। ঠোঁট থেকে কাপ নামিয়ে বললেন, "বাবা আত্মপ্রচার একদম পছন্দ করতেন না। দানধ্যান যা কিছু করতেন, সব আড়াল থেকে। অনেক দরিদ্র পরিবার ঘুম থেকে উঠে দেখেছে, মাথার কাছে কে যেন টাকা রেখে গিয়েছে। বাবা মারা যাওয়ার পর অনেকদিন পর্যন্ত আমিই বিশ্বাস করতাম, এসব ঘটনা প্রচার করার দরকার নেই। দাতাকে ছোট করা হয় তাতে। গত কয়েক বছর হল ভাবনার বদল হয়েছে আমার। এরকম একটা মানুষের কথা পরবর্তী প্রজন্মকে না জানানোটাও ঠিক নয়। বাবার জীবন থেকে অনুপ্রাণিত হবে তারা।"

থেমে আর একবার চায়ে চুমুক দিলেন বীণাপাণিদেবী। ফের বলতে লাগলেন, "কত রকম ইন্টারেস্টিং ঘটনা আছে জানেন! বাবার তখন ষোলো বছর বয়স। আমাদের রাধিকাপুরের জমিদার নবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বাবার তৈরি লাইব্রেরির পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসব পালন করছেন। ঘোষণা করলেন, লাইব্রেরির নিয়মিত পাঠকদের একটা পরীক্ষা নেওয়া হবে। বেছে-বেছে দশটা প্রশ্ন করা হবে লাইব্রেরিতে রাখা দেড় হাজার বই থেকে। যে পাঠক সব ক'টার সঠিক উত্তর দিতে পারবে, পুরস্কৃত করা হবে তাকে। ঘোষণাটা হয়েছিল পরীক্ষার ঠিক একমাস আগে, যে সময়ের মধ্যে দেড় হাজার বই পড়া সম্ভব নয়। বেশ কিছু বই আগে পড়া থাকতে হবে। আমার বাবা অম্বিকাচরণ কর মাত্র ষোলো বছর বয়সে সব ক'টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেন। জমিদার নবকৃষ্ণ খুশি হয়ে বাবাকে বলেছিলেন, 'তুমি আমার গ্রামের সেই সূর্য, যে রাতেও অস্ত যায় না। তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেব।' বাবাকে সোনার মেডেল দিয়েছিলেন জমিদার।"

"জমিদারের বাবার নাম কী ছিল?" প্রায় অপ্রাসঙ্গিক একটা প্রশ্ন করলেন দীপকাকু। কেন করলেন, বুঝে উঠতে পারছে না ঝিনুক। বীণাপাণিদেবী স্মৃতি উদ্ধারে নেমেছেন। অনেক ভেবে বললেন, "মনে পড়েছে। জমিদার নবকৃষ্ণের বাবার নাম ছিল জগমোহন চট্টোপাধ্যায়। লাইব্রেরির নাম 'সরলাবালা গ্রন্থাগার'। মায়ের স্মৃতিতে লাইব্রেরিটা বানিয়েছিলেন। নদিয়া জেলার রাধিকাপুর তখন বেশ বর্ধিষ্ণু জায়গা। এখন গেলে বিশ্বাসই হবে না।"

"তা এসব ঘটনা কি আপনি জীবনী আকারে লিখেছেন?" জানতে চাইলেন দীপকাকু। কাপ তুলে চায়ের শেষ চুমুকটা দিলেন।

বীণাপাণিদেবী বললেন, "লিখেছি অনেক কষ্ট করে। শেষ বয়সে এসে বেশ কিছু কথা ভুলেও গিয়েছি। বই হবে। ছাপতে গিয়েছে।"

"কোন প্রকাশনা ছাপবে বই?" দীপকাকুর প্রশ্নের উত্তরে বীণাপাণিদেবী বললেন, "সেসব আমি কিছু জানি না। আমার এক রিলেটিভ ছাপার ব্যাপারটা ভাল বোঝে। সে নিজের আগ্রহে দায়িত্ব নিয়েছে। পুরনো অনেক ফোটো, বাবার পাওয়া সার্টিফিকেট, মেডেলের ফোটোও থাকবে বইটায়।"

"বাহ্, বেশ যত্ন করেই হচ্ছে কাজটা। বই প্রকাশ হলেই আমাকে জানাবেন, কিনব একটা," বললেন দীপকাকু।

বীণাপাণি মিষ্টি করে হেসে বললেন, "তোমাকে কিনতে হবে না। আমি গিফ্‌ট করব।"

ঝিনুক ভেবেছিল সাক্ষাৎপর্ব বুঝি শেষ, নোটবুক বন্ধ করছিল। দীপকাকু আড্ডার ঢঙে ফের প্রশ্ন করলেন, "এ বাড়িতে আপনার সঙ্গে কে থাকে, ক্লোজ কোনও রিলেটিভ?"

"না, সেরকম কেউ থাকে না।"

"এত বড় বাড়িতে আপনি একা থাকেন?" বিস্ময় প্রকাশ করলেন দীপকাকু।

বীণাপাণি বললেন, "একা কোথায়! দুপুরবেলা বলে বুঝতে পারছ না। আমার সত্তরজন ছাত্রছাত্রী এখন স্কুলে গিয়েছে। ওরা থাকলে গমগম করত একতলাটা।"

ভ্রু কুঁচকে উপরে আঙুল নির্দেশ করে দীপকাকু বললেন, "আপনি সম্ভবত থাকেন দোতলায়। রাতবিরেতে ভয় করে না? তারপর শরীর-টরির খারাপ যদি হয়।"

"যে একটু আগে চা দিয়ে গেল, রেবা। ও রাতে আমার ঘরে থাকে। এ ছাড়া, গেটে সিকিউরিটি আছে। নিচতলায় এত ছেলেমেয়ে। ওদের সুপারিন্টেনডেন্ট। আর চুরি হওয়ার মতো আমার কাছে আছেটা কী? বয়সটাকেই ভয়," থামলেন বীণাপাণি। দীপকাকু শিওর হয়ে নেওয়ার জন্য বললেন, "চুরি হওয়ার মতো কিছু নেই বলছেন?"

"না, ঘটি-বাটি, টিভি ইত্যাদি বাদ দিলে অমল আলো চালাতে গিয়ে আমি প্রায় নিঃশেষ। এখন তোমাদের মতো কোনও এন জি ও যদি এগিয়ে আসে, তা হলে অন্তত মরার আগে আমার প্রতিষ্ঠানকে সচল দেখে যেতে পারব।"

আবেগটা মোটেই স্পর্শ করল না দীপকাকুকে। নিজের অভিনীত চরিত্রও ধরে রাখতে পারলেন না। টিপিক্যাল গোয়েন্দার মতো জানতে চাইলেন, "সংস্থা চালানোর মতো নগদ টাকা কিছু রাখেন না বাড়িতে?"

"না। ব্যাঙ্ক মারফত ট্রানজাকশন হয়। সামান্য হাতখরচের মতো কিছু টাকা আমি নিজের কাছে রাখি," বললেন বীণাপাণি।

দীপকাকুর নড়াচড়া দেখে বোঝা যাচ্ছে, এবার উঠবেন। বীণাপাণিদেবীকে বললেন, "আপনার ফোন নম্বরটা দিন। তিন-চারদিনের মাথায় আমি আসব। ফোন করে নেব আগে। অ্যাপ্লিকেশন, আয়-ব্যয়ের হিসেব রেডি করে রাখবেন।"

দীপকাকু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ড্রয়ার টেনে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে দীপকাকুর দিকে এগিয়ে দিলেন বীণাপাণিদেবী। বললেন, "এতে আমার ফোন নম্বর, অ্যাড্রেস, ই-মেল আইডি সব আছে।"

দীপকাকু দরজার দিকে ঘুরে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন। বীণাপাণিদেবীর দিকে ফিরে বললেন, "একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। আপনি কিন্তু আপনার সবচেয়ে নিকটজনকেও আমার এখানে আসার কারণটা বলবেন না। আমাদের এন জি ও এরকম একটা গ্রান্ট দিতে চলেছে, খবরটা যদি ফাঁস হয়ে যায়, প্রচুর অ্যাপ্লিকেশন জমা

পড়বে অফিসে। তখন অমল আলোর জন্য কিছু করা আমার পক্ষে মুশকিল হয়ে যাবে।"

"কাউকে বলব না। তুমি নিশ্চিন্তে থেকো!"

গেটের বাইরে এসে ঝিনুক বলেই ফেলল, "ভদ্রমহিলাকে এভাবে আশা দেওয়াটা কি ঠিক হল? ইন্টারনেটে যখন দেখবেন, স্প্রাউট-এর কোনও ওয়েবসাইট নেই। দুঃখ পাবেন খুব।"

বাইকে উঠে বসেছেন দীপকাকু, বললেন, "স্প্রাউট-এর ওয়েবসাইট আছে। দিল্লিতেই অফিস। আমার পরিচয়টা মিথ্যে। যা করছি, বীণাপাণি গুপ্তর কোনও ক্ষতি হবে না। লাভ হবে অনেকের। পরে ওঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব।"

ঝিনুক আর কথা বাড়ায় না, দীপকাকুর পিছনে গিয়ে বসে।

॥ ৭ ॥

আজ সুনেত্রাদিদের বাড়িতে বড় একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে, দীপকাকু নিজে না এসে ঝিনুককে পাঠিয়েছেন সরেজমিনে তদন্ত করতে। বাবার গাড়িটা নিয়েছে ঝিনুক। আশুদা চালিয়ে নিয়ে এসেছে সুনেত্রাদির বাড়ি। ঘটনা ঘটেছে এইরকম, সুনেত্রাদি স্কুল থেকে ফিরে দরজার চাবি খুলতেই দ্যাখেন, ঘর একেবারে লন্ডভন্ড! ভয়ে চেঁচামেচি জুড়ে দেন। দোতলা থেকে বাড়িওলা নেমে আসেন। ঘরের অবস্থা দেখে তিনিও হতচকিত। তাঁর কাছেই জানা যায়, দুপুর দু'টো নাগাদ মণিময়দা এসে চাবি চান উপরে গিয়ে। বাড়িওলাকে বলেন, "আমার চাবিটা ভুলে ফেলে গিয়েছি, সঙ্গে দরকারি একটা ফাইল। আর কিছুক্ষণ পরেই অফিসের বোর্ড মিটিং-এ বসব। ব্যাগে ফাইল খুঁজতে গিয়ে দেখি, সেটা তো নেই-ই, বাড়ির চাবিটাও ফেলে এসেছি।"

বাড়িওলা সরল বিশ্বাসে চাবি দিয়ে দেন। মণিময়দাদের ঘরের একই চাবি তিনটে। দু'টো থাকে স্বামী-স্ত্রী দু'জনের কাছে। বিশেষ পরিস্থিতির কথা ভেবে একটা চাবি রাখা ছিল বাড়িওলা সুনিধিবাবুর হেফাজতে। দরকারটা এই প্রথম পড়ল। ব্যবহার করল মণিময়দার ডুপ্লিকেট। দীপকাকুর নির্দেশ মাথায় রেখে বাড়িওলার সামনে ডুপ্লিকেটের প্রসঙ্গ তোলেননি সুনেত্রাদি। সুনিধিবাবুকে উপরে পাঠিয়ে ফোন করেন মণিময়দাকে। জানতে চান, বাড়িতে এসেছিলেন কিনা? মণিময়দা বলেন, "কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সকালে অফিসে ভিজিট দিয়েই বেরিয়ে পড়েছি ফিল্ড ওয়ার্কে। আমি এখন শ্রীরামপুরে। সন্ধের আগে বাড়ি ফিরতে পারব না। মিস্টার বাগচীকে ফোন করে ডেকে নাও।"

সুনেত্রাদি দীপকাকুকে ফোন করে ঘটনাটা জানান। দীপকাকু বলেন, "আমি অন্য একটা কাজে আছি। ঝিনুককে পাঠিয়ে দিচ্ছি ব্যাপারটা দেখতে। ও না যাওয়া পর্যন্ত ঘরটা যে অবস্থায় আছে, তেমনই রাখবেন। কোনও কিছু গোছাতে যাবেন না।"

দীপকাকুর অর্ডার আসার আগেই ঝিনুকের কাছে ফোন যায় সুনেত্রাদির। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে অনুযোগ করলেন, "ব্যাপারটা এত সিরিয়াস, তোমার কাকু কি একবার আসতে পারতেন না!"

সুনেত্রাদির লাইন ছেড়ে ঝিনুক তখনই ফোন করেছিল দীপকাকুকে। উনি কিছু না শুনেই বলতে থাকলেন, "ঠিক আছে, তুমি চলে যাও ওঁদের বাড়ি। সব কিছু বুঝে নিয়ে ফোন করে জানাও।"

লন্ডভন্ড হয়ে থাকা সুনেত্রাদিদের ড্রয়িংরুমে ঝিনুক এখন গম্ভীর মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ ঘুরছে ঘরের চারপাশে। দেখছে অনেক কিছুই, কোন বিষয়ের উপর বিশেষ নজর দেবে বুঝে উঠতে পারছে না। সোফাসেটের অবস্থান এলোমেলো, কর্নার র‍্যাক ফল্‌স গাছসুদ্ধ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। দেওয়ালে ঝোলানো ফ্ল্যাট টিভিসেটও যেন বেঁকে আছে একটু। র‍্যাক ফাঁকা করে বই ছড়ানো-ছেটানো চারপাশে। এসবের মাঝে ভীতমুখে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুনেত্রাদি। ঝিনুক ওঁর দিকে দৃষ্টি স্থির করে বলল, "চলুন, লিভিংরুমটা দেখা যাক।"

প্যাসেজে দাঁড়িয়ে পড়ল ঝিনুক। চোখ আটকেছে বাঁ দিকে পড়ে থাকা একরাশ খবরের কাগজের দিকে। সেখানে আবার কিছু শু, চপ্পলও দেখা যাচ্ছে। আন্দাজ করা যায় দেওয়াল থেকে বেরিয়ে আসা আধখানা থামের আড়ালে আছে শু র‍্যাক আর পুরনো নিউজ পেপারের স্টক।

সুনেত্রাদি ঝিনুকের দৃষ্টিকে অনুসরণ করে বললেন, "আমিও দেখেছি কাগজগুলো পড়ে আছে। তবে মনে হয় ওখানে হাত দেয়নি। কাগজ অনেক জমে গিয়েছে। বিক্রি করা হচ্ছে না। ক'দিন আগেও পড়ে গিয়েছিল।"

ঝিনুক দীপকাকুর কাছে শিখেছে, তদন্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে নিখুঁত পর্যবেক্ষণ। সামান্য অসংগতিও উপেক্ষা করা যাবে না। থামের কাছে এগিয়ে গিয়েছে ঝিনুক, কাগজগুলোর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে। ঝুঁকে দেখতে থাকে তারিখ। যদি সিরিয়াল থাকে, বুঝতে হবে বানডিল থেকে নেমে এসেছে কোনও কিছুর ধাক্কা খেয়ে। তারিখ এদিক-ওদিক হওয়া মানেই ডুপ্লিকেটের হাত পড়েছে এখানেও। ডেটগুলো মোটামুটি পরপর আছে দেখে নিয়ে ঝিনুক সোজা হল। শু র‍্যাক থেকে পড়ে যাওয়া চটি, জুতোগুলো তুলতে যাচ্ছিলেন সুনেত্রাদি, ঝিনুক মানা করে। বলল, "যেখানকার জিনিস, সেখানেই থাক।"

একপাটি প্রায় নতুন জেন্টস চপ্পল সুনেত্রাদির হাতে, কোম্পানির স্টিকার এখনও ওঠেনি, সাইজটাও দেখা যাচ্ছে, আট নম্বর। ঠিক যেভাবে চটি পড়েছিল মেঝেয়, সুনেত্রাদি তেমন করেই রাখলেন। ঝিনুক এগিয়ে যায় লিভিংরুমের দিকে। ঘরে পা দিয়ে মাথা পাক খেয়ে যায় ঝিনুকের, যেন ঘূর্ণিঝড় ঢুকে পড়েছিল। বিছানার চাদর, গদি, বইখাতা, দেওয়ালে টাঙানো মুখোশ, ক্যালেন্ডার সমস্তটাই এলোমেলো। সব ছাড়িয়ে বন্ধ স্টিলের আলমারিটা ঝিনুককে যেন ডেকে নেয়। মেঝেয় পড়ে থাকা জিনিসপত্র ডিঙিয়ে ঝিনুক আলমারির হ্যান্ডেলে হাত রাখে। চাপ মেরে দ্যাখে, লক আছে। ঘাড় ফিরিয়ে সুনেত্রাদিকে জিজ্ঞেস করে, "এটা বন্ধই ছিল তো?"

ঘাড় কাত করলেন সুনেত্রাদি। মুখে বললেন, "চাবিটাই বোধ হয় খুঁজছিল।"

"চাবি কি আপনাদের সঙ্গে থাকে? বাইরে নিয়ে বেরোন?" জিজ্ঞেস করল ঝিনুক।

"না, এ ঘরেই আছে। বুদ্ধি করে একটা জায়গা বার করেছি আমরা। আমি আর মণিময় শুধু জানি।"

চাবিটা কোথায় জানতে চাওয়া শোভন হবে না। ঝিনুক বলল, "আমি বাইরের ঘরে আছি। চাবিটা বের করে আলমারি খুলে একবার দেখে নিন, সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা। এমন হতে পারে, চাবিটা খুঁজে পেয়ে যা হাতানোর হাতিয়ে, আবার আগের জায়গায়ই রেখে গিয়েছে।"

ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ঝিনুক। ড্রয়িংরুমে পৌঁছে ভাবতে থাকে দীপকাকুর পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি। হামাগুড়ি দেওয়া দীপকাকুর ভঙ্গিটা ভেসে ওঠে মাথায়। অর্থাৎ পায়ের ছাপ দেখতে হবে। ঝিনুকের কাছে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস নেই। এমনিই একবার ট্রাই করে দেখা যাক।

বইয়ের র‍্যাকের কাছে গিয়ে উবু হয় ঝিনুক। এখানে দাঁড়িয়ে নিশ্চয়ই বইগুলো মেঝেয় ফেলেছে। হামাগুড়ি দিতে থাকে ঝিনুক। পুরনো আমলের সিমেন্ট ঘষা মেঝে, কোনও পায়ের অথবা জুতোর ছাপ চোখে পড়ছে না। মেঝে খুবই পরিষ্কার, সকালেই হয়তো মুছে গিয়েছে কাজের লোক।

"এ কী, তুমি কী খুঁজছ?" ভয়-বিস্ময় মেশানো সুনেত্রাদির গলা।

ঘরে এসে থমকে দাঁড়িয়েছেন হাতে হাত ঝেড়ে উঠে দাঁড়ায় ঝিনুক। বলল, "দেখছিলাম, পায়ের ছাপ-টাপ যদি থাকে।"

"পেলে?"

"না," বলার পর ঝিনুক জিজ্ঞেস করে, "আলমারির সব জিনিস দেখে নিয়েছেন? হাত পড়েনি তো?"

মাথা নাড়লেন সুনেত্রাদি। বললেন, "সব ঠিকই আছে।"

বড় সোফাটায় বসলেন সুনেত্রাদি। এটাও আগের জায়গা থেকে অনেকটা সরে গিয়েছে। ফের সুনেত্রাদি কথা শুরু করলেন, "দেখে-

শুনে কী মনে হচ্ছে তোমার, লোকটা কেন ঢুকেছিল?"

"অ্যাপারেন্টলি মনে হচ্ছে, কিছু একটা খুঁজছিল। ছোটখাটো জিনিস। সেরকম কিছু মিসিং হয়েছে কিনা, সেটা আপনারাই বলতে পারবেন।"

"ঘর না গোছানো পর্যন্ত বলা সম্ভব নয়। দামি তেমন কিছু ছিলও না বাইরে।"

"আপনার কাছে দামি না হলেও, তার কাছে হয়তো মূল্য আছে," বলার পর ঝিনুক প্রসঙ্গ পালটায়। জানতে চায়, "বাড়িওলার সঙ্গে কি একবার কথা বলা যাবে?"

"অবশ্যই যাবে। খুবই ভালমানুষ। দাঁড়াও, আমি ডেকে আনছি," বলে সোফা থেকে উঠে সদর পেরোলেন সুনেত্রাদি।

কাল বাবা অফিস থেকে ফিরেই অমল আলোর সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। ঝিনুক ওখানে ঢোকা থেকে বেরনো পর্যন্ত যা-যা ঘটেছিল, বলেছিল সবটাই। বেশ কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে এক কাপ চা শেষ করে বাবা বলেছিলেন, "অম্বিকাচরণ করের জীবনী ছাপার দায়িত্ব যে মণিময় নিয়েছে, এটা তো পরিষ্কার। যেহেতু ওদের বাড়িতে প্রিন্টিং প্রেস ছিল, বই প্রকাশের ব্যাপারটা মোটামুটি জানে। কিন্তু তার সঙ্গে দীপঙ্কর যে অপরাধকাণ্ডের আশঙ্কা করছে, তার লিঙ্ক কোথায়?"

যোগাযোগটা ঝিনুক তখন ধরতে পারেনি, এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, আছে। ওলটপালট ঘরটাই ঝিনুককে ধরিয়ে দিচ্ছে লিঙ্কটা। দীপকাকু এই ঘটনাটাকে লাইটলি না নিলেই পারতেন। ঝিনুককে দায়িত্ব না দিয়ে নিজে এলে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারতেন দ্রুত। তাঁর সঙ্গে ঝিনুকের পর্যবেক্ষণের আসমান-জমিন ফারাক। ঝিনুকের কেন জানি মনে হচ্ছে, বীণাপাণিদেবীর ম্যানুস্ক্রিপ্ট হাতাতেই লোকটা হানা দিয়েছিল এ বাড়িতে। সম্ভবত ওই পাণ্ডুলিপি থেকে বই হলে কারও স্বার্থে ঘা লাগবে। বড় কোনও ক্ষতির মুখে পড়বে সে। মণিময়দার ডুপ্লিকেট জোগাড় করে পাণ্ডুলিপি উদ্ধারে নেমেছে ব্যক্তিটি। এখন সমস্যা হচ্ছে, মণিময়দা-সুনেত্রাদির কাছে ম্যানুস্ক্রিপ্টের প্রসঙ্গ তুলতেই পারবে না ঝিনুক। বলতে পারবে না, "দেখুন তো পাণ্ডুলিপিটা আছে কিনা?" সঙ্গে-সঙ্গে প্রশ্ন আসবে, "তুমি কী করে জানলে ওটা আমাদের কাছে আছে?" বলা যাবে না বীণাপাণিদেবীর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা। দীপকাকু ওখানে নিজেদের মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিলেন। এই সিচুয়েশনে একমাত্র দীপকাকুই পারেন কায়দা করে পাণ্ডুলিপির প্রসঙ্গটা উত্থাপন করতে।

বাড়িওলাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন সুনেত্রাদি। নিরীহ, ছাপোষা চেহারা ষাটোর্ধ্ব সুনিধিবাবুর। ঝিনুকদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। বলে ওঠেন, "এইটুকুন মেয়ে, গোয়েন্দা!"

"আমি কখন বললাম, ও গোয়েন্দা? ডিটেকটিভ এজেন্সিতে চাকরি করে। আমার দূরসম্পর্কের বোন। আপনি বসুন," সুনিধিবাবুকে সোফা দেখালেন সুনেত্রাদি।

বসলেন ভদ্রলোক। এখনও কপালে ভাঁজ, ঝিনুকের পেশা নিয়ে সন্দেহ কাটেনি। যতটা সম্ভব গম্ভীর অ্যাটিটিউট নিয়ে ঝিনুক প্রশ্নে যায়, "যে লোকটি আপনার কাছে চাবি নিতে এসেছিল, ড্রেসটা একটু মনে করে বলতে পারবেন?"

সুনিধিবাবু বেশ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, "যে লোকটা মানে! এসেছিল তো মণিময়। সে আমার কাছে চাবি নিয়েছে, খানিক পরে ফেরতও দিয়ে গিয়েছে। এর বেশি কিছু আমি জানি না।"

সাবধানে কথা এগোতে হবে। দীপকাকুর পারমিশন ছাড়া ডুপ্লিকেটের কথা বলা যাবে না। ঝিনুক বলল, "ঘরটা লন্ডভন্ড দেখেই

একটু সন্দেহ হচ্ছে, আপনি নিজের হাতে মণিময়দাকে চাবি দিয়েছেন, নাকি দরজার কাছে এসে কেউ চাবিটা চেয়েছে, আপনি তখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন, ব্যক্তিটিকে মণিময়দা ধরে নিয়ে কারও হাত দিয়ে চাবিটা পাঠিয়েছিলেন?"

রাগে তড়াক করে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সুনিধিবাবু। বললেন, "এসবের মানে কী? এ তো গভীর ষড়যন্ত্র। আমি হাতে করে চাবি দিলাম মণিময়কে, সে এখন ঘরে এসে শিবের নেত্য করবে না রাগপ্রধান গাইবে, তার দায়িত্ব আমি নিতে যাব কেন?"

"প্লিজ, আপনি উত্তেজিত হবেন না। আমাদের সমস্যাটা..."

ঝিনুককে কথা শেষ করতে দিলেন না সুনিধিবাবু। সজোরে মাথা নেড়ে বলতে লাগলেন, "না-না, এত রিস্ক নিয়ে আমি ভাড়াটে রাখতে পারব না। এর পর কবে কী চুরি হবে, দোষ চাপবে আমার ঘাড়ে।"

ঝিনুক নার্ভাস হয়ে সোফা ছেড়ে উঠে পড়েছে। তারই ভুলে সিচুয়েশন চলে যাচ্ছে হাতের বাইরে। কীভাবে ম্যানেজ করবে বুঝতে পারছে না। সুনিধিবাবু বলে চলেছেন, "ছিঃ ছিঃ, এ কী অন্যায়! একটা নির্দোষ মানুষকে এভাবে ফাঁসানো? না-না সুনেত্রা, তোমরা ভাই অন্য বাড়ি দেখে নাও।"

কথা শেষ করে মুহূর্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন সুনিধিবাবু। ঝিনুক পুরো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। নিজেকে ভীষণ অপরাধী লাগছে। তার জন্যই ভাড়াটিয়া-বাড়িওলার সম্পর্কটা খারাপ হয়ে গেল। সুনেত্রাদিদের উঠে যেতে হবে কম ভাড়ার বাড়িটা ছেড়ে।

"কী হল? তুমি মনে হচ্ছে খুব এমব্যারাস্‌ড। বসো তো।"

সুনেত্রাদির কথায় সংবিৎ ফেরে ঝিনুকের। বসে পড়ে সোফায়। সুনেত্রাদি ফের বললেন, "অত চিন্তা কোরো না। সুনিধিবাবু ঝামেলা এড়িয়ে চলা ভিতু প্রকৃতির মানুষ। তোমার কথা শুনে তাই ওভাবে রিঅ্যাক্ট করলেন। পরে ওঁকে আমি বুঝিয়ে বলব।"

দীপকাকু যখন কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, মনে হয় ব্যাপারটা কী এমন শক্ত? প্রশ্নের জালে অপর পক্ষকে ক্রমশ নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলেন। দু'-একটা ক্ষেত্রে সামান্য বাধা এসেছে, অনায়াসে টপকে গিয়েছেন। ঝিনুক এই প্রথম উপলব্ধি করল ইন্টারোগেশন কাজটি কতটা কঠিন!

"আচ্ছা, কিচেনের জিনিসপত্রে হাত দেওয়া যাবে?"

সুনেত্রাদির প্রশ্নটা ধরতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ঝিনুক। এবার উনি একটু ভেঙে বললেন, "আসলে সেই কখন স্কুল থেকে ফিরেছি। খিদে পেয়েছে। তুমি তো কোনও কিছুতেই হাত দিতে দিচ্ছ না।"

কথাটা বলে এমন অসহায় মুখভঙ্গি করলেন সুনেত্রাদি, ঝিনুকের মুখে হাসি চলে এল।

প্রায় একঘণ্টা কেটে গিয়েছে। মণিময়দার অপেক্ষায় বসে রয়েছে ঝিনুক। সুনেত্রাদিই বলেছেন, "ওর সঙ্গে একটু দেখা করে যেয়ো। আমি সব কিছু গুছিয়ে বলতে পারব না।"

ইতিমধ্যে সুনেত্রাদি চিঁড়ের পোলাও, কফি তৈরি করেছেন। খাওয়া হয়েছে দু'জনে মিলে। সুনেত্রাদি যখন কিচেনে ছিলেন, ঝিনুক দীপকাকুকে ফোন করে মাত্র দু'টো কথা বলে নেয়, "আপনি কি আসবেন? ঘরের যা অবস্থা, এদের তো ওঠাবসা করতে অসুবিধে হচ্ছে।"

"আসব না। ঘর গুছিয়ে ফেলতে বলো।"

সব কিছু গুছিয়ে ফেললে, দীপকাকুকে বলার সময় কিছু পয়েন্ট বাদ থেকে যেতে পারে। ঝুঁকি নেয়নি ঝিনুক। নিজের সেলফোনের ক্যামেরায় দু'টো ঘরের ফোটো তুলে রেখেছে।

ঘর এখন গোছানোগাছানো। সুনেত্রাদি, ঝিনুক মিলে খোশগল্প জুড়েছেন। প্রসঙ্গ সাম্প্রতিক একটা বাংলা সিনেমা।

সদর ভেজানো ছিল। প্রথমে বুটের শব্দ। তারপর খুলে গেল দরজা। মণিময়দা এসেছেন। ঝিনুকদের আড্ডার ভঙ্গি দেখে অবাক হয়েছেন ভীষণ।

সুনেত্রা বললেন, "কী ভাবছ, ফল্‌স ডেকে পাঠিয়েছি? কিছুই ঘটেনি বাড়িতে?"

জুতো ছেড়ে অফিসব্যাগ হাতে ঘরে ঢুকে এলেন মণিময়দা। ব্যাগটা সুনেত্রাদির হাতে ধরিয়ে দিয়ে বসে পড়লেন সোফায়। চেহারায় বিষণ্ণ, বিধ্বস্ত ভাব। ভিতরের ঘরে ব্যাগ রেখে জলের গ্লাস নিয়ে ফিরলেন সুনেত্রাদি। বললেন, "দু'টো ঘরের অবস্থাই খুব খারাপ ছিল। কিছু একটা খুঁজছিল লোকটা। সম্ভবত পায়নি। মিস্টার বাগচীর পারমিশন নিয়ে আমি, ঝিনুক ঘর গুছিয়ে ফেললাম। সব ঠিকঠাকই আছে। তবু তুমি একবার চেক করে নিও।"

কথাগুলোর মাঝে সুনেত্রাদির হাত থেকে গ্লাস নিয়ে জল খেলেন মণিময়দা। ঝিনুকের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "তোমার কাকুর ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না," থামলেন মণিময়দা, ঝিনুক পরের কথাটার জন্য অপেক্ষা করে।

নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে মণিময়দা বললেন, "এখানে যেমন এই অবস্থা, আমাদের সালকিয়ার বাড়িতেও আজ একটা কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। আমাকে জড়িয়েই।"

"কী কাণ্ড?" ঝিনুক, সুনেত্রাদি একসঙ্গে জানতে চাইলেন।

মণিময়দা শুরু করলেন বলতে, "একটা লোক বাবাকে গিয়ে বলে, সে নাকি বছর দশেক আগে একটা কবিতার বই আমাকে ছাপতে দিয়েছিল। আমিই নাকি পাণ্ডুলিপি চেয়ে নিয়েছিলাম। ওর কবিতা এত ভাল লেগেছিল আমার! তারপর হঠাৎ চাকরি পেয়ে সে বিদেশে চলে যায়। এখন সেই বই অথবা পাণ্ডুলিপিটা তার চাই," পরের কথায় যাওয়ার আগে একটু থামলেন মণিময়দা।

ঝিনুক জিজ্ঞেস করে নেয়, "লোকটা দেখতে কেমন, নাম কী বলেছে?"

"নাম বলছে অমিত সেনগুপ্ত। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, দামি গাড়ি নিয়ে এসেছিল।"

সুনেত্রাদি জানতে চাইলেন, "কাণ্ডটা কী ঘটেছে, সেটা বলো।"

"প্রথমেই যেটা বলতে হয়, কোনও কবিতা সংগ্রহের পাণ্ডুলিপি আমি আজ পর্যন্ত কারও থেকে চেয়ে নিইনি। কেউ আমাকে দিয়েও রাখেনি। এবার লোকটার চালাকিটা শোনো, বাবা যখনই বলেছেন, ছেলে কোথায় পাণ্ডুলিপি রেখেছে আমি কী করে জানব? প্রেসের কারবার আমাদের অনেকদিন আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তুমি ফোন করে মণিময়ের থেকে জেনে নাও, কোথায় রেখেছে তোমার জিনিস," পজ নিলেন মণিময়দা।

সুনেত্রাদির তর সইছে না। চোখ বড়-বড় হয়েই আছে। বললেন, "তারপর?"

শুরু করলেন মণিময়দা, "লোকটা জানাল, তার কাছে আমার ফোন নম্বর নেই। দীর্ঘদিন যোগাযোগ হয় না। একসময় খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। বাবা আমার নম্বর দিলেন, লোকটা আমার সঙ্গে কথাও বলল। আসলে পুরোটা অ্যাকটিং। ফোন কেটে বাবাকে জানাল, আমি নাকি আমার বইয়ের র‍্যাকটা দেখতে বলেছি। বাবা সরল বিশ্বাসে লোকটাকে নিয়ে গিয়েছিল আমার পুরনো ঘরে। বইয়ের র‍্যাক ঘেঁটে লোকটা বলে, 'না, পাওয়া গেল না। ঠিক আছে, মণিময়ের ফোন নম্বর তো রইল, পরে যোগাযোগ করে নিচ্ছি।'"

"ও বাড়ির ঘটনাটা আপনাকে কে জানাল?" কথার মাঝেই জিজ্ঞেস করল ঝিনুক।

মণিময়দা বললেন, "আমার ছোটভাই ফোন করে জানিয়েছে ঘটনা ঘটার এক ঘণ্টা পরে। কী একটা কাজে বিজনেস ছেড়ে সন্ধেবেলা বাড়ি এসেছিল, বাবার থেকে লোকটার কথা জেনে ওর খটকা লাগে। সঙ্গে-সঙ্গে ফোন করে আমাকে। ভাইয়ের থেকে কিছুটা শুনে নিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলে ডিটেলে ব্যাপারটা জানি। তারপরই ফোন করি মিস্টার বাগচীকে। ততক্ষণে উনি এ বাড়ির ঘটনাটাও জেনে গিয়েছেন। আমি সালকিয়ার বাড়ির কাণ্ডটা বলে জানতে চাইলাম, 'এই দু'টো ইনসিডেন্টের মধ্যে কোনও যোগসূত্র থাকতে পারে কি?' উনি বললেন, 'সাদা চোখে রিলেশন একটাই, আপনি নিজে। বেহালায় আপনার ফ্লোরে হানা দিয়েছে, সালকিয়ায় পৌঁছে গিয়েছে বইয়ের

র‍্যাক পর্যন্ত। এ ছাড়া, এখনই আর কিছু বলা যাচ্ছে না। আবার এমনও হতে পারে, দশ বছর আগে কেউ হয়তো সত্যিই আপনাকে ম্যানুস্ক্রিপ্ট দিয়েছিল। এত দিনের ব্যাপার, ভুলে যাওয়া অসম্ভব কিছু না। এখন একটা অ্যাংজাইটির মধ্যে আছেন, অপ্রত্যাশিত যে-কোনও ঘটনাকেই অশুভ ইঙ্গিত মনে হচ্ছে',” থামলেন মণিময়দা। ওঁকে এখন আরও বেশি বিমর্ষ দেখাচ্ছে।

ঝিনুক কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। মণিময়দাই শুরু করলেন, “আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, মিস্টার বাগচী আমাদের কেসটা খুব একটা সিরিয়াসলি নেননি। অ্যাসাইনমেন্ট যেহেতু নিজের ক্লোজ সার্কেল থেকে এসেছে, উনি বুঝতে পারছেন খুব একটা প্রফেশনাল হওয়া যাবে না।”

ঝিনুকের কান গরম হয়ে যাচ্ছে। সোফা ছেড়ে উঠতে-উঠতে বলল, “বিষয়টাকে ওভাবে দেখবেন না। আপনিই বরং কেসটাকে প্রথমে লাইটলি নিয়েছিলেন। সুনেত্রাদি আপনার ডুপ্লিকেটকে দেখার পর যখন আমাদের ডেকে পাঠালেন, আপনি বলেছিলেন, ওটা সুনেত্রাদির অহেতুক ভয়।”

“একদম ঠিক বলছে ঝিনুক,” সমর্থন জানালেন সুনেত্রাদি।

ঝিনুক সদর লক্ষ করে এগিয়ে যেতে-যেতে বলতে থাকে, “অন্য কোনও কেসের জরুরি কাজে নিশ্চয়ই আটকে গিয়েছেন দীপকাকু। আমি গিয়ে রিপোর্ট করার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। আপনাদের চিন্তা করার কোনও কারণ নেই।”

দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেট পেরিয়ে গেল ঝিনুক। রাগটা ভালই দেখানো গিয়েছে। ঘুরে গেট লাগাতে গিয়ে দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুনেত্রাদি। চেহারায় অপরাধী ভাব।

গাড়ির কাছে পৌঁছতেই আশুদা বলল, “খানিক আগে একটা পাগলা মতো লোক এসে হুজ্জত করে গেল।”

“কী বলল?” জিজ্ঞেস করে ঝিনুক।

“এখানে কেন গাড়ি লাগিয়েছি? কার গাড়ি, কোন অফিসের? কে এসেছে? দাঁড়াও ব্যবস্থা নিচ্ছি,” বলে হনহন করে চলে গেল।

“কোথায় গেল?”

“তুমি যে বাড়ি থেকে বেরোলে, ঢুকে গেল ওখানেই। আমি তো ভাবছি, তোমাদের কাছে গিয়ে ঝামেলা না পাকায়।”

ঝিনুক বুঝতে পারে, লোকটা বাড়িওলা। সুনিধিবাবু যখন বেরিয়েছেন খেয়াল করেনি আশুদা, ঢুকতে দেখেছে। চেহারা যতই নিরীহ হোক, বাড়িওলাটিকে সুবিধের মনে হচ্ছে না ঝিনুকের। এঁকে নিয়েও দীপকাকুর ভাবা উচিত। পিছনের গেট খুলে গাড়িতে উঠে বসে ঝিনুক।

॥ ৮ ॥

মণিময়দাদের কেসটা আলটিমেটলি ছেড়ে দিলেন দীপকাকু। পাঁচদিন কেটে গিয়েছে। এই প্রথম দীপকাকুকে কোনও কেস মাঝপথে ছেড়ে দিতে দেখল ঝিনুক। আরও হয়তো ছেড়েছেন, ঝিনুক সেসব কেসে ছিল না। অপমানিত হওয়ার কারণেই দীপকাকু সম্ভবত কেসটা ছাড়লেন। মণিময়দা পরপর দু'বার দীপকাকুর আত্মসম্মানে ঘা দিয়েছেন। প্রথমবার ঝিনুকের মাধ্যমে, দ্বিতীয়বার দীপকাকুর অফিসে এসে সরাসরি অপমান করলেন। তখনই দীপকাকু জানিয়ে দেন, কেসটা নিয়ে আর এগোবেন না।

কেস ছেড়ে দিলেও বীণাপাণিদেবীর বাবাকে দীপকাকু ছাড়েননি। অম্বিকাচরণ করের ব্যাপারে উনি ভীষণ আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। ঝিনুককে বলেছেন, “সময়টার কথা একবার ভাব, অম্বিকাচরণের জন্ম ১৮৯২। জাস্ট একবছর আগে বিদ্যাসাগর মারা গিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখনও বেঁচে। জগদীশচন্দ্র বসু তখন প্রেসিডেন্সিতে পড়াচ্ছেন। বিজ্ঞান গবেষণায় সাড়া ফেলে দিয়েছেন স্বদেশে-বিদেশে। রবীন্দ্রনাথ সে সময় নিজস্ব প্রতিভায় ভাস্বর। একবছর পরেই বিবেকানন্দ যাচ্ছেন শিকাগোয় বক্তৃতা দিতে। ওই সব জ্যোতিষ্কর ছটায় অম্বিকাচরণকে সেভাবে চোখে পড়েনি মানুষের। উনি নিজেও প্রচারবিমুখ ছিলেন। কত দরিদ্র পরিবারকে সাহায্য করছেন, উৎসাহ দিয়েছেন লেখাপড়ায়। বীণাপাণি গুপ্তর লেখা ওঁর জীবনী বই হয়ে বেরোলে, ক'কপি আর ছাপা হবে! বেশি লোকের হাতে পৌঁছবে না। অম্বিকাচরণ ছাড়াও জমিদার জগমোহন চট্টোপাধ্যায়, তাঁর পুত্র নবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের অবদানও সমাজে কিছু কম নয়। ১৮৫৮ সালে জগমোহন রাধিকাপুরের মতো অখ্যাত জায়গায় লাইব্রেরি স্থাপন করছেন। সেই লাইব্রেরির পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি ধুমধাম করে পালন করছেন ছেলে নবকৃষ্ণ। শিক্ষার প্রসারও যে প্রজাপালনের একটা অঙ্গ, ভালমতোই উপলব্ধি করেছিলেন এঁরা। বাংলার নবজাগরণে এঁদের কন্ট্রিবিউশন কিছু কম নয়। ইতিহাসে এই সব চরিত্র উপেক্ষিত রয়ে গিয়েছে।”

দীপকাকুর হঠাৎই এই ইতিহাসপ্রীতির কারণ সম্ভবত ওঁর আর্কিওলজিস্ট ক্লায়েন্ট ডক্টর সমরেশ রায়। বীণাপাণিদেবীর বাবার সম্বন্ধে হয়তো আলোচনা করতে গিয়েছিলেন দীপকাকু। ডক্টর রায় ওঁকে উনিশ শতকের গভীরে নিয়ে গিয়েছেন। মাঝে একদিন বাবা, ঝিনুক গিয়েছিলেন দীপকাকুর অফিসে। সেদিনও ভিজিটর্স এরিয়ায় অনেকক্ষণ বসতে হয়েছিল। কাচঘেরা কেবিনে বসে দীপকাকু, ডক্টর রায় দীর্ঘক্ষণ ধরে আলোচনা করছিলেন। ইতিহাসের নেশা এমনই পেয়ে বসেছে দীপকাকুর, আজ ঝিনুককে নিয়ে চলেছেন রাধিকাপুরে অম্বিকাচরণের আদি বাড়িতে। লাইব্রেরি, জমিদারবাড়ি সব কিছুই ঘুরে দেখার ইচ্ছে আছে দীপকাকুর। তদন্তের কাজ ছাড়া দীপকাকুর সঙ্গে এভাবে ঘোরার সুযোগ কখনও হয়নি ঝিনুকের।

বাবার গাড়িতে চলেছে ঝিনুকরা। কলকাতা থেকে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার পথ। বর্ধমান জেলা শেষ হচ্ছে সমুদ্রগড়ের মাঝখানে। তারপর নদিয়া জেলার রাধিকাপুর।

যাত্রার শুরু থেকেই পিছনের সিটে বসে বই পড়ে চলেছেন দীপকাকু।

পিছনের সিটে জানলার ধারে বসা ঝিনুক একফাঁকে দেখে নিয়েছে দীপকাকুর বইটার নাম, 'আ স্কেচ অফ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দা নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট, ১৭৯৫-১৮৪৫'। লেখক, জর্জ ম্যালে। আর ওদিকে তাকায়নি ঝিনুক। ব্যান্ডেলের কাছে এসে চা খাওয়ার জন্য একটা বাজার এলাকায় আশুদাকে বলে গাড়ি দাঁড় করিয়েছিলেন দীপকাকু। ঝিনুক তখনই নিজের জন্য একটা ম্যাগাজিন কেনে। কিন্তু পড়ায় কিছুতেই মন বসাতে পারছে না। মণিময়দাদের কেসটা হাত থেকে চলে যাওয়ার আক্ষেপ এখনও কাটেনি ঝিনুকের। সুনেত্রাদিদের ফ্লোরে একা ইনভেস্টিগেট করে আসার একদিন পরেই কেসটা বেশ জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। পরের দিন সুনেত্রাদিসহ মণিময় এসেছিলেন দীপকাকুর অফিসে। এমন বিহেভ করলেন মণিময়দা, দীপকাকু রেগেমেগে কাজটা ছেড়েই দিলেন। পরপর দু'বার ঘটল তো ঘটনাটা, ঝিনুকের কাছেও দীপকাকুর উদ্দেশে অসম্মানজনক কথা বলেন মণিময়দা। দীপকাকু সবই শুনেছেন, রাগ তো হবেই।

ডুপ্লিকেটের তাণ্ডব, বাড়িওলার অ্যাবনর্মাল বিহেভিয়ার, মণিময়দার ক্ষোভ প্রত্যক্ষ করে ঝিনুক বাড়ি ফেরার পথে গাড়িতে বসেই দীপকাকুকে ফোন করেছিল রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। উনি ফোন তুলেই বলেছিলেন, “রাতে সব শুনব। এখন একটু ব্যস্ত আছি।”

ঝিনুককে রিপোর্ট করতে হয়নি। বাবা ঝিনুকের থেকে সব শুনে নিয়ে রাত দশটা নাগাদ দীপকাকুকে ফোন করেছিলেন। সুনেত্রাদির বাড়ির ঘটনা জানিয়ে, নিজস্ব মতামত হিসেবে বাবা বলেছিলেন, “আমার মনে হচ্ছে বাড়িওলাই কলকাঠি নাড়ছে। কম টাকার ভাড়াটেকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে, বেশি টাকার ভাড়াটে বসানোর মতলব।”

ফোনের ওপারে দীপকাকুর উত্তরটা শোনার উপায় ছিল না ঝিনুকের, বাবার অনুমানটা গ্রহণযোগ্যই মনে হয়েছিল। কিন্তু মণিময়দার সালকিয়ার বাড়িতে ঢুকে পড়া ফ্রেঞ্চকাট ব্যক্তিটি কে? ওখানে হানা দিয়ে বেহালার বাড়ি থেকে মণিময়দাদের ওঠানো যাবে না। বড়জোর একটা ধাঁধা তৈরি হবে।

ফোনে দীপকাকুর সঙ্গে কথা সেরে বাবা ঝিনুককে বলেছিলেন, "সেলফোনে তোলা সুনেত্রাদের বাড়ির ফোটোগুলো তোকে ই-মেল করে দিতে বলল।"

সেই রাতেই সেন্ড করেছিল ঝিনুক। সঙ্গে ছোট্ট একটা মেসেজও পাঠায়, 'হোয়াট নেক্সট?'

উত্তর এসেছিল একদিন পরে। সকাল দশটা নাগাদ ফোন করলেন দীপকাকু। আগের কোনও প্রসঙ্গ আলোচনা না করে বলেছিলেন, "তুমি এখনই যাদবপুরের শপিং মলে চলে যাও। গাড়ি বা ট্যাক্সিতে ওঠার আগে সুনেত্রাকে ফোন করবে। প্রথমে জানতে চাইবে, 'মণিময় কোথায়?' সুনেত্রা বলবে, 'অফিস টুরে দুর্গাপুরে।' তখন তুমি জানাবে, যাদবপুরের মলে এসেছ শপিং করতে। মণিময়ের ডুপ্লিকেটকে একটা লোকের সঙ্গে ঢুকতে দেখেছ। এই মুহূর্তে তাদের দেখতে পাচ্ছ না। খুঁজছ। সুনেত্রা যেন এক্ষুনি শপিংমলে চলে আসে।"

নিজেকে কন্ট্রোল করতে না পেরে কথা কেটে ঝিনুক বলে উঠেছিল, "না দেখেই এত কথা বলে দেব। গাড়িতে যেতে-যেতে বললেই বা অসুবিধে কী?"

"অসুবিধে আছে। তোমার ফোনের ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড শুনে সুনেত্রা বুঝে যাবে, গাড়িতে আছ। কথার মাঝে কথা বোলো না। পুরোটা শুনে নাও।"

দীপকাকুর ধমক খেয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছিল ঝিনুক। ফের দীপকাকু বলতে থাকেন, "শপিং মলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে তুমি। কুদঘাট থেকে যাদবপুর ডিসট্যান্স কম, আগে পৌঁছে যাবে। সুনেত্রা এলে বলবে, ডুপ্লিকেট আর লোকটা ফুডকোর্টে বসেছে। ঢুকবে শপিং মলে, ডানহাতি ফুডকোর্টের সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পাবে কোণের দিকে ডুপ্লিকেট তার সঙ্গীর সঙ্গে বসে চা-কফি জাতীয় কিছু খাচ্ছে। দেখাবে সুনেত্রাকে। যদি সুনেত্রা এগিয়ে গিয়ে ডুপ্লিকেটের কাছে পৌঁছতে চায়, যেতে দেবে না তুমি। বলবে, 'ডুপ্লিকেট আপনাকে দেখে আগের দিনের মতোই হুড়োহুড়ি করে পালাবে। বিচ্ছিরি সিন হবে সেটা। আশপাশের লোকের প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে।' সুনেত্রাকে নিয়ে মলের বাইরে চলে আসবে। মণিময়কেই সম্ভবত প্রথমে ফোন করবে সুনেত্রা। তুমি খানিক তফাতে গিয়ে আমাকে রিপোর্ট করবে ফোনে। ওকে? সব ঠিকঠাক বুঝে নিয়েছ?"

ঝিনুক বলেছিল, "বুঝেছি।"

"নাউ ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম। বি কুইক!"

ওঁর তাড়ার চোটে বাবাকে কিছু জানায়নি ঝিনুক। বাবা তখন ঘরে ছিলেন না। গাড়ি চাইতে গেলে দেরি হয়ে যেত। ড্রেসআপ করে মাকে বলেছিল, "কাজ আছে। এক্ষুনি ঘুরে আসছি।"

বাড়ির বাইরে গিয়ে সুনেত্রাদিকে ফোন করেছিল ঝিনুক। দীপকাকুর শিখিয়ে দেওয়া কথাগুলোই বলল। তারপর ট্যাক্সি ধরে রওনা দিয়েছিল।

শপিং মলের সামনে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। হন্তদন্ত হয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমেছিলেন সুনেত্রাদি। তারপর দীপকাকু যা-যা বলেছিলেন, প্রায় তাই ঘটল। যেন চিত্রনাট্য সাজিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু কলাকুশলীদের ডিরেকশন কে দিলেন, বোঝা গেল না! মেন আর্টিস্ট মণিময়দার ডুপ্লিকেটের সঙ্গে তো দীপকাকুর আঁতাত হওয়ার কথা নয়! চিত্রনাট্যের বাইরে ঘটেছিল দু'টো বিষয়। ডুপ্লিকেটের সঙ্গে অচেনা কেউ ছিল না। ছিলেন পল্লব ঘোষ। দীপকাকু সম্ভবত জানতেন। ঝিনুককে ইচ্ছে করেই বলেননি। পল্লব ঘোষের সঙ্গে যে দেখা হয়েছে ঝিনুকদের, মণিময়দাদের সেটা জানানো হয়নি। ঝিনুক যদি মুখ ফসকে প্রথমেই সুনেত্রাদিকে পল্লব ঘোষের কথা বলে দেয়, সমস্যার সৃষ্টি হবে। চিত্রনাট্যবহির্ভূত দ্বিতীয় কাণ্ডটি হল, সুনেত্রাদিকে মোটেই রোখা যায়নি! ডুপ্লিকেটকে ধরার জন্য ঢুকে পড়েছিলেন ফুডকোর্টে। টের পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে লোকটি টি শার্টের কলার তুলে মুখ আড়াল করে দ্রুত সরে পড়ে। পল্লব ঘোষও প্রায় ভোজবাজির মতো উধাও হয়ে যায়। সুনেত্রাদি গজগজ করতে থাকেন, "আমি প্রথমেই বলেছিলাম, পল্লব ঘোষই পিছনে লেগেছে। জোগাড় করেছে মণিময়ের ডুপ্লিকেট।"

শপিং মলের বাইরে এসে মণিময়দাকে ফোন করে একই কথা জানিয়েছিলেন সুনেত্রাদি। ঝিনুক একটু সরে গিয়ে দীপকাকুকে ফোন করে জানায়, "কাজ হয়ে গিয়েছে। এর পর কী করব?"

দীপকাকু বলেছিলেন, "আপাতত বাড়ি ফিরে যাও। কাল ফার্স্ট আওয়ারে রজতদাকে নিয়ে আমার অফিসে এসো।"

পরের দিন মাথায় অনেক প্রশ্ন নিয়ে বাবা আর ঝিনুক এগারোটা নাগাদ পৌঁছেছিলেন দীপকাকুর অফিসে। দ্বিতীয়বার ডক্টর সমরেশ রায়কে দেখা গেল কাচঘেরা কেবিনে। দীপকাকুর সঙ্গে আলোচনায় মগ্ন। ঝিনুকদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল ভিজিটর্স এরিয়ায়।

ডক্টর রায় চলে যাওয়ার পর বাবা, ঝিনুক ঢুকেছিলেন কেবিনে। বাবা প্রথমেই জানতে চান, "সমরেশবাবুর কেসের কিছু সুরাহা হল?"

হেসে মাথা নাড়লেন দীপকাকু।

বাবা গিয়ে বসেছিলেন দীপকাকুর পাশের চেয়ারে, ওখানেই বসেন। সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বোঝা যায়। ঝিনুক বসেছিল দীপকাকুর উলটো দিকের চেয়ারে। টেবিলে পাঁচটা হিস্ট্রির বই। দু'টো বাংলা, তিনটে ইংরেজি। দীপকাকুর সামনে খোলা প্যাড, দু'টো ফ্যামিলির বংশলতিকা করা হয়েছে। দুই লতিকার ভাগ হয়ে যাওয়া ভার্টিকাল লাইনগুলোর নীচে অনেক ক'টা নামের মধ্যে কিছু চেনা লাগছিল ঝিনুকের। যেমন, জগমোহন, নবকৃষ্ণ। অন্য লতিকায় অম্বিকাচরণ, বীণাপাণি, সুনেত্রা। যাঁরা গত হয়েছেন, নামের পাশে ব্র্যাকেটে জন্ম, মৃত্যুসাল। জীবিত হলে শুধু জন্মের সালটাই। ঝিনুক বুঝতেই পেরেছিল, এসবই মণিময়দাদের কেসের অঙ্গ। তখন ভাবতেই পারেনি, দীপকাকু এতটা ইতিহাসমুখী হয়ে পড়বেন। গাড়িতে বসে জানলার বাইরে প্রায় তাকাচ্ছেনই না, পড়ে যাচ্ছেন গবেষণামূলক ভারী বই।

বাবা সেদিন গলা ঝেড়ে আলাদা ফুর্তি নিয়ে দীপকাকুকে বলেছিলেন, "কালকের ম্যাজিকটা কী করে করলে বলো তো? তুমি দেখছি ভগবানের রোল প্লে করছ। ঘটনা ঘটাচ্ছ ইচ্ছেমতো।"

মিটমিটে হেসে দীপকাকু বলেছিলেন, "সব যদি বলে দিই কেসের চার্মটাই চলে যাবে।"

"কৌতূহল চেপে রাখারও তো একটা লিমিট আছে। তুমি নানা খেল দেখিয়ে যাবে, আমরা চুপ করে বসে থাকব, তা তো হয় না। ঝিনুক তোমার ঘোষিত অ্যাসিস্ট্যান্ট, ওর রীতিমতো অধিকার আছে জানার," বাবার বক্তব্যের শেষে চা নিয়ে ঢুকেছিল ফুটের দোকানের ছেলেটা। ঝিনুকদের অফিসে ঢুকতে দেখে দীপকাকু নিশ্চয়ই ফোনে অর্ডার দিয়েছিলেন।

ছেলেটা যখন চায়ের দাম নিচ্ছে, বাবা গ্লাস তুলে নিয়ে বলেছিলেন, "কী ব্যাপার, সুদর্শন নেই! আজও কোনও কাজে পাঠিয়েছ নাকি?"

"না, আমিই আজ ঘণ্টা দুয়েক দেরি করে আসতে বলেছি," বলেছিলেন দীপকাকু।

'কেন?' কথাটা ঠোঁটে চলে এসেছিল, বলেনি ঝিনুক। কত কিছুই কারণ থাকতে পারে। এমন সময় দীপকাকুর অফিসে ঢুকেছিলেন মণিময়দা, সুনেত্রাদি।

কেবিনে ঢোকার সৌজন্যমূলক অনুমতিটুকু চাইলেন না দু'জনে। বসে পড়লেন চেয়ারে। দীপকাকুর মুখ-চোখ তখন একেবারেই নির্বিকার। কপাল কুঁচকে মণিময়দা বলা শুরু করলেন, "আমাদের কেসটা নিয়ে আপনার ভাবনাচিন্তা ঠিক কোন পর্যায়ে, কিছুতেই বুঝতে পারছি না।"

"আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো একটু বলুন," ঠান্ডা গলায় বলেছিলেন দীপকাকু।

মণিময়দা বলতে থাকলেন, "আমাদের ঘর তছনছ করা হল, ভিজিট তো দিলেনই না, ঘটনাটা নিয়ে কোনও আলোচনাও করলেন না আমাদের সঙ্গে। সালকিয়ার বাড়িতে ফ্রেঞ্চকাটের আগমনটাকেও আমার স্মৃতির দুর্বলতা হিসেবে ধরছেন। ডুপ্লিকেটের আই কার্ড ফেরত দেওয়ার জন্য ট্যাক্সির মালিক এল পাড়ায়, ট্যাক্সির নম্বরও পাড়ার লোক মারফত আপনাকে দিলাম। এখনও পর্যন্ত কোনও ফিডব্যাক দিলেন না। আদৌ আপনি কেসটা নিয়ে এগোচ্ছেন কিনা, সেটাই বোঝা

দুষ্কর হয়ে উঠছে। আর কাল অত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, বোঝাই যাচ্ছে কে ষড়যন্ত্রের পিছনে, আপনি অদ্ভুত ভাবে নির্বিকার। ঘটনাটা আপনাকে জানাতে গেলাম, বললেন, 'ঝিনুকের থেকে শুনেছি। কাল অফিসে আসুন, কথা হবে। এখন ব্যস্ত।' আমরা যে কী ভীষণ দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছি, তা নিয়ে আপনার কোনও তাপ-উত্তাপ নেই।"

অভিযোগের লিস্ট শুনে গুম হয়ে বসে রইলেন দীপকাকু। লজ্জা, কুণ্ঠা, বিব্রত কোনও ভাবই দেখা যাচ্ছিল না মুখে। এতক্ষণ যেন অন্য কারও নামে কমপ্লেন শুনলেন। 'ডুপ্লিকেটের আই কার্ড' ব্যাপারটা নিয়ে মণিময়দার সঙ্গে যে কথা হয়েছে, দীপকাকু বলেননি ঝিনুককে। না বলার কোনও কারণ আছে, নাকি আগ্রহ হয়নি বলার, বুঝতে পারছিল না ঝিনুক। দীপকাকুর পরের কথাটায় উত্তরটা পেয়ে যায়। মণিময়দার মুখের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বলেছিলেন, "আপনাদের কেসটায় আমি কোনও চার্ম পাচ্ছি না। অন্য কোনও ডিটেকটিভকে তদন্তের ভার দিতে পারেন। আই কুইট।"

দীপকাকু যে হঠাৎ করে এরকম একটা ডিসিশান নেবেন, কেবিনের চারজনের কল্পনায়ও ছিল না। উইকেটে জমে যাওয়া ব্যাটসম্যান যেন নিজের ব্যাট দিয়ে উইকেট ভেঙে ফিরে যাচ্ছে প্যাভিলিয়নে। ঘটনার আকস্মিকতা সামলাতে একটু সময় লেগেছিল মণিময়দার। চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে বলেছিলেন, "তা হলে তো আমাদের আর কিছু বলার নেই।"

কেবিন থেকে বেরনোর সময় সুনেত্রাদি তাকিয়েছিলেন ঝিনুকের দিকে। বড় মনখারাপের দৃষ্টি।

ওঁদের অফিসের দরজা পেরিয়ে যেতে দেখে বাবা দীপকাকুকে বলেছিলেন, "কী ব্যাপার হল! কেসটা তো মেরেই এনেছিলে, দুম করে হাত তুলে নিলে কেন?"

"ধুর ধুর, কাজ দিয়ে মাথা কিনে নিয়েছে নাকি? আগেরবার ঝিনুককে আমার নামে উলটোপালটা বলেছে, আজ সরাসরি আমাকে! যাক না কেসটা নিয়ে অন্য কোনও ডিটেকটিভের কাছে, দেখি কত দূর কী করতে পারে," একরাশ বিরক্তি নিয়ে বলেছিলেন দীপকাকু।

সঙ্গত কারণেই এই ক্ষোভ। বাবা, ঝিনুক দু'জনেই চুপ। পরিবেশ হালকা করতে চেয়ে বাবা বলেছিলেন, "ছাড় ওদের ব্যাপার। কালকের ধাঁধাটা একটু পরিষ্কার করো। কী করে জানলে পল্লব ঘোষ আর ডুপ্লিকেট মলের ফুডকোর্টে থাকবে?"

"ওদের কেস নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না," বলে দীপকাকু চলে গিয়েছিলেন উনিশ শতকের গল্পে। বাংলার সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল তখন... ঝিনুকের ভাবনা হোঁচট খেল চলন্ত গাড়ির বাইরে একটা দোকানের বোর্ড পড়ে, নামের নীচে 'সমুদ্রগড়' লেখা। দীপকাকুকে বলল, "সমুদ্রগড় চলে এলাম।"

বই থেকে মুখ তুলে দীপকাকু অবাক গলায় জানতে চাইলেন, "সমুদ্রগড়টা কী?"

দীপকাকুর ভুলো মনের সামান্য নিদর্শন এটা, ঝিনুক এখন আর বিস্মিত হয় না। স্বাভাবিক গলায় বলল, "এর পরই তো রাধিকাপুর।"

"ও, হ্যাঁ। তাই তো," বলে সোজা হয়ে বসলেন দীপকাকু। বই মুড়ে আশুদার উদ্দেশে বললেন, "রাধিকাপুর এলেই গাড়ি দাঁড় করিও। লোকজনের থেকে জানতে হবে জমিদারবাড়িটা কোথায়?"

ঘাড় হেলাল আশুদা। ঝিনুক জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকে, দোকানপাট চোখে পড়ছে খুব কম। ফাঁকা মাঠ, চাষের জমি, দু'-চারটে চালাঘরের বাড়ি।

ঝিনুকরা এখন লাইব্রেরিতে। জমিদারবাড়ি ঘোরা হয়ে গিয়েছে। এখানকার লোক 'রাজবাড়ি' বলে ডাকে। একটা অংশে সরকারি অফিস, বাকিটার রক্ষণাবেক্ষণ মন্দ নয়। অম্বিকাচরণের ভিটে দেখে বড় মন খারাপ হল ঝিনুকের, প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। লাইব্রেরির অবস্থা বেশ ভাল। সরলাবালা গ্রন্থাগার নিয়ে এলাকার মানুষের একটা গর্বও আছে। একটি লোক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ঝিনুকদের গাড়িতে উঠে পৌঁছে দিল লাইব্রেরিতে। লাইব্রেরিয়ান যেভাবে খাতির করে ঝিনুকদের ভিতরে নিয়ে গেলেন, বোঝাই যাচ্ছিল দীপকাকু ফোন করেই এসেছেন।

জমিরবাড়ির আদলেই তৈরি হয়েছে লাইব্রেরি বিল্ডিং। ছোট সংস্করণও বলা যায়। র‍্যাকভর্তি বইগুলোয় চোখ বোলাতে-বোলাতে দীপকাকু বলে উঠেছিলেন, "তখন যদিও এত বই ছিল না। তবু একটি ষোলো বছরের ছেলে গোটা লাইব্রেরির বই পড়ে ফেলেছিল! বিভিন্ন বই থেকে করা দশটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে দেয়! আজকালকার দিনে ভাবা যায় এসব।"

একটা ফুট না কেটে আর পারেনি ঝিনুক। বলেছিল, "অম্বিকাচরণ যদি এ সময়ের স্টুডেন্ট হতেন, উনিও পারতেন না। এখন তো সাজেশানের যুগ।"

হেসে ফেলেছিলেন দীপকাকু। এর পরই লাইব্রেরিয়ান একটা বই নিয়ে এলেন, 'আ বেঙ্গল জমিনদার, নবকৃষ্ণ চ্যাটার্জি অ্যান্ড হিজ টাইমস।' লেখক ডক্টর নির্মলচন্দ্র সরকার। বইটা দীপকাকুর হাতে দিয়ে বললেন, "এসব বই তো ইসু হয় না। একটাই কপি, খুবই পুরনো। যত্ন করে পাতা ওলটাবেন।"

এরকম আরও দশটা দুষ্প্রাপ্য বই, যেগুলোর কোনওটাই এই লাইব্রেরির মেম্বাররা বাড়ি নিয়ে যেতে পারেন না, লাইব্রেরিয়ান জমা করেছেন দীপকাকুর সামনে। চেয়ার-টেবিলে বসে দীপকাকু সেইসব বইয়ে একেবারে ডুবে গিয়েছেন, কখনও এটার দু' পাতা পড়ছেন, কখনও ওটার। পড়তে-পড়তে বেখেয়ালে চুলে আঙুল চালিয়ে মাথা করেছেন উসকোখুসকো। দু'টো পা-ই কখনও তুলে নিচ্ছিলেন চেয়ারে, খানিক পরে নামাচ্ছেন একটা পা। পরের পা-টাও নামাবেন, নাকি নামানো পা-টা আবার তুলে নেবেন, এই সব দিকেই মন চলে যাচ্ছিল ঝিনুকের। বই সে-ও ওলটাচ্ছিল বটে, পড়ছিল না। একসময় বিরক্ত হয়ে লাইব্রেরির বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সেই থেকে দাঁড়িয়েই আছে। ঢোকার সময় লক্ষ করেনি, এখান থেকে গঙ্গা দেখা যায়। ঝিনুক ঠিক করে, সামনের শীতে বাবা, মাকে নিয়ে এখানে বেড়াতে আসবে। দীপকাকুকেও আনা যেতে পারে, তবে উনি হয়তো নদীর ধারে বেড়াতে না গিয়ে লাইব্রেরিতেই সময় কাটিয়ে দেবেন।

এই মুহূর্তে কিন্তু দীপকাকু বই ছেড়ে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। নদীর দিকে তাকিয়ে বড় করে আড়মোড়া ভাঙলেন। মুখটা বেশ খুশি-খুশি। ঝিনুকের পাশে এসে বললেন, "ইতিহাস আর অতীতকে আমরা হামেশাই এক আসনে বসিয়ে দিই। একটু তলিয়ে দেখলে ইতিহাসের মতো সদা সক্রিয়, জীবন্ত আর কিছু হয় না।"

দীপকাকুর কথাটাকে মূর্তিমান ধাঁধার মতো লাগে ঝিনুকের। এখন এটা নিয়ে মোটেই ভাববে না। নদীর বুকে দুলতে-দুলতে এগিয়ে চলা নৌকোর সাবলীল গতিটাই বড় মনোরম লাগছে তার।

॥ ৯ ॥

মণিময়দাদের কেসটা নিয়ে দীপকাকু পাহাড়ি আবহাওয়ার মতো খামখেয়ালি আচরণ করছেন। এই রোদ তো একটু পরেই বৃষ্টি। রোদ উঠলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ো, বৃষ্টি পড়লে দরজা এঁটে ঘরে বসে থাকো চুপচাপ। আজ রোদ উঠেছে। গত রাতে দীপকাকু ফোন করে ঝিনুককে বলেছেন, "কাল সকাল সাড়ে ন'টায় গাড়ি নিয়ে পৌঁছে যাবে গোবরায়। অমল আলোর অপোজিটে একটু দূরে দাঁড়িয়ে গেটের দিকে লক্ষ রাখবে। আমি ফোনে নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কোনও অ্যাকশনে যাবে না। ওয়াচ করাটাই শুধু তোমার জন্য। একমাত্র কেউ যদি অমল আলো থেকে বেরিয়ে পালায়, তাকে চেজ করে ধরবে।"

দীপকাকুর নির্দেশমতো বাবার থেকে গাড়ি নিয়ে ঝিনুক সাড়ে ন'টার একটু আগেই চলে এসেছে গোবরায়। আশুদাই চালিয়ে এনেছে। দশটা বাজতে চলল, এখনও পর্যন্ত কিছু ঘটেনি। অমল আলোর বিশাল গেটের একপাশে টুলের উপর বসে আছে সিকিউরিটির লোক, অলস দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। অমল আলো-তে আজ ঠিক কী ঘটতে চলেছে, ঝিনুক জানে না। কেসটা আদৌ মণিময়দাদের সম্পর্কিত কি

না, এ ব্যাপারে সে খুব একটা নিশ্চিত নয়। দীপকাকু নির্দেশটুকু দিয়ে ফোন কেটেছিলেন। প্রশ্ন করার কোনও সুযোগ দেননি। বীণাপাণিদেবী যেহেতু সুনেত্রাদির পিসিঠাকুরমা, ঝিনুক ধরে নিয়েছে কেসটা সুনেত্রাদিদেরই। তা হলে দীপকাকু যে বড় ধরনের অপরাধের আশঙ্কা করছিলেন, সেটা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটতে চলেছে? এরকম আরও অনেক প্রশ্ন নিয়ে ঝিনুক নিজেই গাড়িতে কোমরের ঠেসান দিয়ে জিজ্ঞাসাচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পজিশন নিয়েছে আশুদাও, ফিট কুড়ি দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে গাছের আড়ালে। অ্যাকশনকালীন ঝিনুক যদি বেকায়দায় পড়ে, দৌড়ে গিয়ে হেল্প করবে আশুদা। আগেও বেশ কয়েকবার করেছে। ভাবতে ভাবতেই ঝিনুক দ্যাখে, অমল আলোর গেটের সামনে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসাচিহ্নের ভঙ্গি ছেড়ে পূর্ণচ্ছেদের মতো দাঁড়ায় ঝিনুক, কে নামছে ট্যাক্সি থেকে দেখতে হবে। কপাল এমন খারাপ, একটা স্কুলবাস দৃষ্টিপথ আড়াল করে দাঁড়াল। ঝিনুক বাঁ হাত বরাবর দৌড়তে থাকে, রাস্তার এপার থেকেই গেটের মুখোমুখি হয়ে দেখতে হবে অমল আলোয় কে এল?

লাভ হল না। স্কুলবাসটাও স্টুডেন্ট তুলে ঝিনুকের সঙ্গে চলতে শুরু করল। দাঁড়িয়ে পড়ল ঝিনুক। চলে গেল বাস, অমল আলোর গেটে কোনও ট্যাক্সি নেই। দরোয়ান বসে আছে আগের মতোই। ট্যাক্সি থামার ঘটনাটা যেন ঝিনুকের দৃষ্টিভ্রম।

সেলফোন বের করে দীপকাকুর নম্বর টেপে ঝিনুক। সেট কানে নিয়ে গাড়ির দিকে ফিরতে থাকে। অমল আলোর গেটের মুখোমুখি দাঁড়ানো চলবে না, বারণ আছে দীপকাকুর। ফোন ধরলেন কাকু, "বলো?"

"ট্যাক্সি থেমেছিল গেটের কাছে, কেউ হয়তো ঢুকল," বলল ঝিনুক।

রুক্ষ গলায় দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "হয়তো কেন? কে ঢুকল, মহিলা না পুরুষ, ক'জন ঢুকল?"

"একটা স্কুলবাস এমন সামনে চলে এল...," ঝিনুকের কথা শেষ হয়নি, দীপকাকু ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "যখন যে কাজটা করবে, পুরোটা করবে। অর্ধেকটা নয়।"

লাইন কেটে দিলেন দীপকাকু। ঝিনুক মন খারাপ করে ফের গাড়িতে ঠেসান দিয়ে দাঁড়াল। আশুদা এসেছে পাশে। জানতে চাইল, "হঠাৎ কেন দৌড়লে দিদিভাই?"

চকিতে আশার আলো দেখতে পায় ঝিনুক। অমল আলোর গেটের দিকে আঙুল তুলে আশুদাকে জিজ্ঞেস করে, "ওখানে একটু আগে একটা ট্যাক্সি দাঁড়াল না, নামতে দেখলে কাউকে?"

দু' পাশে মাথা নাড়ে আশুদা। বলল, "না, আমি তো তোমার দিকেই খেয়াল রাখছিলাম।"

হতাশ হয় ঝিনুক। ফের তাকিয়ে থাকে অমল আলোর গেটের দিকে। বেশিক্ষণ অবশ্য তাকাতে হল না, হঠাৎ দৃশ্য বদল। দরোয়ান গেটের পাশে নিজের ঘরে ঢুকল তড়িৎ গতিতে। কিছু একটা ঘটেছে ভিতরে। স্নায়ু টানটান হয়ে অপেক্ষা করে ঝিনুক, কান রাখে খাড়া, হ্যাঁ, অমল আলোর বিল্ডিং-এ নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে! ভেসে আসছে হইচই। বাচ্চাদের গলা। দৌড়তে থাকে ঝিনুক, দরোয়ানের ঘরের ভিতর দিয়ে ঢুকে পড়ে অমল আলোর বিল্ডিং-এ। খানিক দূরে অফিস ঘরের সামনে ভিড়, ছুটে যায় ঝিনুক। ভিড়ের অধিকাংশ হস্টেলের ছাত্রছাত্রী। বীণাপাণিদেবীকেও দেখা গেল। বাকি সকলে এখানকার কর্মচারী। পরিস্থিতি যা বোঝা যাচ্ছে, কোনও দুষ্কৃতী অফিসঘরের তালা ভেঙেছে। কখন ভাঙা হয়েছে, জানা যাচ্ছে না। একজন স্টাফ দশটার একটু পরে এসে অফিসঘরের তালা খুলতে যাবেন, তখন দ্যাখেন এই অবস্থা!

অমল আলোর ছাত্রছাত্রীদের মুখে অন্ধকার নেমে এসেছে। তন্নতন্ন করে দেখা হচ্ছে অফিসঘর। কী চুরি গিয়েছে? একটি ক্লাস থ্রি-ফোরের ছাত্রী রেবা নামের মহিলাটিকে বারবার জিজ্ঞেস করছে, "সব চুরি হয়ে গিয়েছে পিসি? আমাদের হস্টেল বন্ধ হয়ে যাবে? বলো না।"

"দাঁড়া তো, জ্বালাস না," বলে রেবাও চঞ্চল দৃষ্টি বোলান ঘরের চারপাশে। তাঁকেও বুঝতে হবে কী চুরি গেল, চাকরিটা আদৌ থাকবে কি না তাঁর? কত বড় ক্ষতি হল প্রতিষ্ঠানের, কে জানে!

তদন্তে কি নামবে ঝিনুক? ঘটনা ঘটার পর যত তাড়াতাড়ি ইনভেস্টিগেশনে যাওয়া যায়, সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়ে। তবু দীপকাকুর থেকে একবার পারমিশন নেওয়া উচিত।

ঘটনার টানে ঝিনুক অফিসঘরে ঢুকে পড়েছিল, বেরিয়ে এসে দীপকাকুকে ফোনে ধরে। এখানকার সমস্ত ঘটনা জানায়। জিজ্ঞেস করে, তদন্তে হাত দেবে কিনা?

দীপকাকু প্রথমে জানতে চাইলেন, "তুমি যে ওখানে পৌঁছেছ, ওঁরা কি খেয়াল করেছেন? দু'-তিনজন কিন্তু তোমাকে চেনেন।"

"সম্ভবত খেয়াল করেননি। সবাই ঘটনাটা নিয়ে টেনশনে আছেন।"

"তা হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অমল আলো থেকে বেরিয়ে পড়ো। তোমার আসল পরিচয় বীণাপাণিদেবী জানেন না। জানালেও যে তোমাকে তদন্ত করতে দেবেন না। আগে কেন মিথ্যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে জানতে চাইবেন। এত কিছু সামলাতে পারবে না তুমি। ইতিমধ্যে ওঁরা হয়তো পুলিশ ডেকে ফেলেছেন। পুলিশ এসে যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, এখানে যে চুরি হবে তুমি নিশ্চয়ই জানতে, নয়তো দাঁড়িয়ে ছিলে কেন? পুলিশ সব ছেড়ে তখন..."

"বুঝেছি," বলে ফোন কাটে ঝিনুক।

সন্ধেবেলা ঝিনুকদের বাড়ির ডোরবেল বাজল। ঝিনুক জানে দীপকাকু এলেন। বিকেলবেলা ফোন করে বলেছিলেন, "সন্ধের পর আসছি। রজতদা থাকলে ভাল হয়, অনেকদিন দাবা নিয়ে বসা হয়নি।" দুপুরে অমল আলোর ঘটনা নিয়ে একটা কথাও খরচ করেননি দীপকাকু।

ঝিনুক দরজা খুলল। দীপকাকু ঘরে ঢুকে মায়ের উদ্দেশে গলা তুললেন, "বউদি, আমার এক ক্লায়েন্ট আসছে। চা একসঙ্গেই দেবেন।"

সোফায় বসে থাকা বাবার দৃষ্টিতে সামান্য কৌতূহল দেখা দিল। সেই দিকে তাকিয়ে দীপকাকু বললেন, "অবাক হচ্ছেন তো, আপনার বাড়িতে ক্লায়েন্ট ভিজিট করছি কেন? কী করব, এখানে আসার পথে ফোনটা এল। আবার কোথায় যাব? এখানেই চলে আসতে বললাম।"

নিজের নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বসলেন দীপকাকু। বড় সোফার শেষ প্রান্তে। ওখানে কর্নার টেবিলে দাবার বোর্ড সাজানো থাকে, এখনও আছে। পাশে সিঙ্গল সোফায় বাবা। খেলার দিকে বাবার এখন মন নেই। মুখ-চোখ একটু যেন সিরিয়াস। দীপকাকুকে বললেন, "মণিময়দের কেসে যে অপরাধের আশঙ্কা তুমি করছিলে, আজ দুপুরে সেটা ঘটে গেল?"

"একদম ঠিক," স্বীকার করলেন দীপকাকু।

"ঘটনাটা কবে, কখন, কোথায় ঘটবে, সবটাই আন্দাজ করতে পেরেছিলে তুমি। সেই কারণেই ঝিনুককে পাহারায় রেখেছিলে।"

"এগেন ইউ আর রাইট।"

"অপরাধীকে তার মানে ধরা গেল না?"

দীপকাকু জবাব দিতে যাবেন, ফের ডোরবেল বেজে উঠল। সম্ভবত ক্লায়েন্ট। বেতের গোল টুলটায় বসেছিল ঝিনুক, উঠে গিয়ে দরজা খোলে। ক্লায়েন্ট দেখে রীতিমতো সারপ্রাইজড সে। তবে একজন নয়, দু'জন এসেছেন, সুনেত্রাদি, মণিময়দা।

"আসুন-আসুন," বলে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানায় ঝিনুক।

সুনেত্রাদি সিঙ্গল সোফাটায় গিয়ে বসলেন। বড় সোফায় মণিময়দা। আজ ওঁর এক্সপ্রেশনটা আগের দিনের ঠিক বিপরীত, চেহারা জুড়ে কুণ্ঠিত ভাব। কথা শুরু করতে যাচ্ছিলেন সুনেত্রাদি, তার আগেই দীপকাকু ওঁর উদ্দেশে বলে ওঠেন, "আপনি তো বললেন একা আসছেন। উনি অফিস টুরে দুর্গাপুরে।"

"আজই দুর্গাপুরে গিয়েছে। ফোনে যখন পিসিদিদার বাড়ির ঘটনাটা জানলাম, সবে ট্রেন থেকে নেমেছে। বলেছিল, কাজ ম্যানেজ করতে পারলে আজই ফিরছি। ভাবিনি ফিরতে পারবে। একটু আগে আমার সঙ্গে জয়েন করল," বলে থামলেন সুনেত্রাদি।

এবার মণিময়দা বিনীত কণ্ঠে বললেন, "আগের দিন আপনার

সঙ্গে যেভাবে বিহেভ করেছি, তার জন্যে আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি।"

"ইট্‌স ওকে। পরের কথা বলুন," সৌজন্য উপেক্ষার সুরে বললেন দীপকাকু।

একই বিনয় বজায় রেখে মণিময়দা বললেন, "আমরা চাইছি আপনি ফের কেসটা হাতে নিন।"

"কারণ?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

মণিময়দা বললেন, "চুরিটা যখন আমার ডুপ্লিকেট করেছে এবং এই কেসটা নিয়ে আপনি অনেকটা এগিয়েও ছিলেন, সল্‌ভ করতে পারবেন তাড়াতাড়ি।"

বাবা তো বটেই, ঝিনুকও এই প্রথম জানল চুরি করেছে ডুপ্লিকেট। রাগ হচ্ছে দীপকাকুর উপর। সবই জানতেন, কিছুই বলেননি।

কী যেন একটু ভেবে নিয়ে দীপকাকু বললেন, "জিনিস চুরি হয়েছে বীণাপাণি গুপ্তর, উনি কি রাজি হবেন আমাকে তদন্তভার দিতে? চুরি যখন হয়েই গিয়েছে, কোনও গোপনীয়তার ব্যাপারও যখন নেই, বীণাপাণিদেবী অনায়াসে পুলিশের কাছে যেতে পারেন। কলকাতা পুলিশ যথেষ্ট এফিসিয়েন্ট এসব কাজে।"

সুনেত্রাদি বললেন, "আমি বলেছিলাম এফ আই আর করতে, পিসিদিদা রাজি হলেন না। অমল আলোয় পুলিশ যাতায়াত করুক, আশপাশের লোক এই নিয়ে ভালমন্দ আলোচনা চালাক, এটা ওঁর একেবারেই পছন্দ নয়।"

"দেখুন, যেসব জিনিস চুরি গিয়েছে, অম্বিকাচরণের সার্টিফিকেট, মেডেল, ফোটো এসবের সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু হাই হলেও, অর্থমূল্য তেমন কিছু নয়। ওর মধ্যে সোনার মেডেল বলছেন, একটাই ছিল। কত আর দাম হবে, আমার পারিশ্রমিকের চেয়ে সামান্য কম-বেশি। আমাকে কেসের ভার দিয়ে লাভ সেরকম কিছু হবে না। পুলিশ দায়িত্ব নিলে কোনও খরচই হত না।"

দীপকাকুর দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হল, সুনেত্রাদি বললেন, "টাকাপয়সা নিয়ে ভাববেন না। পিসিদিদাকেও রাজি করানো যাবে না পুলিশের ব্যাপারে। এদিকে জিনিসগুলো হারিয়ে উনি খুবই ভেঙে পড়েছেন। আমারও খারাপ লাগছে খুব, মনে হচ্ছে আমাদের বংশগৌরব বুঝি হারিয়ে গিয়েছে। টাকা দিয়ে এর মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। আপনিই কেসের ভার নিন। পিসিদিদাকে আপনার কথা বলেছি, উনি রাজি হয়েছেন।"

গম্ভীর হয়ে ভাবতে থাকলেন দীপকাকু। সুনেত্রাদি ফের ক্লান্ত কণ্ঠস্বরে অনুরোধ করলেন, "প্লিজ, কাজটা আপনি নিন। আমি একটু নিশ্চিন্ত হই। সকাল থেকে যা যাচ্ছে।"

চট করে মুখ ফেরালেন দীপকাকু। সুনেত্রাদিকে জিজ্ঞেস করলেন, "আর কী হয়েছে?"

"সে আর বলবেন না। স্কুলে প্রায় পৌঁছে গিয়েছি, মণিময় ফোন করে বলল, বাড়িতে ল্যাপটপ ফেলে গিয়েছে, আমাকে দিয়ে আসতে হবে হাওড়া স্টেশনে। ও নিতে এলে ট্রেন ফেল করবে। বাড়ি এসে ল্যাপটপ নিয়ে ছুটলাম স্টেশনে। মণিময়কে ল্যাপটপ হ্যান্ডওভার করলাম। স্কুলে এসে দু'টো ক্লাস নিয়েছি, পিসিদিদার ফোন। জানলাম ঘটনাটা, তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লাম গোবরার উদ্দেশে।"

সুনেত্রাদি থামতেই দীপকাকু বললেন, "আপনার পিসিদিদার ঠিকানা, ফোন নম্বর দিন। আমি যাব বলে রাখবেন।"

মণিময়দা পার্স থেকে বার করলেন বীণাপাণি গুপ্তর সেই কার্ড, যা

ঝিনুকরা আগেই পেয়েছে খোদ বীণাপাণিদেবীর কাছ থেকেই।

দীপকাকু কার্ড অযথাই একবার পড়ে নিয়ে শার্টের পকেটে রাখলেন। উঠে পড়লেন মণিময়দারা। দু'জনেই দীপকাকু, বাবাকে হাতজোড় করে বললেন, "চলি।"

দীপকাকু মাথা নাড়লেন। বাবা নিশ্চল, কেসটার ভাবনায় সম্ভবত তলিয়ে গিয়েছেন। মণিময়দারা চলে যেতেই মা ঢুকলেন চা নিয়ে। অবাক হয়ে বলে উঠলেন, "এ কী, ওরা চলে গেল!"

বিব্রত হন দীপকাকু। বললেন, "তাই তো, আমিই তো আপনাকে বললাম চা করতে।"

ট্রে থেকে দু' কাপ চা সেন্টার টেবিলে নামিয়ে মা বললেন, "তুমি না হয় ভুলো মানুষ, ঝিনুকের তো এগুলো খেয়াল রাখা উচিত। তা হলে আর কিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট হল! ক্লায়েন্টদের আপ্যায়নের দিকটা দেখবে না?"

মায়ের কথা কানে গেলেও, কোনও প্রতিক্রিয়া হল না ঝিনুকের, বাবার মতোই সে এখন কেসের চিন্তায় বিহ্বল।

মা ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর বাবা বললেন, "কেসটা তা হলে ফিরে এল। ভিতর-ভিতর অর্ধেকটা সেরে রেখেছ কাজ। জানতে, কখন, কী চুরি হতে যাচ্ছে। তাই এত খোশমেজাজ। এখন শুধু চোরাই জিনিসগুলো উদ্ধার করা বাকি।"

"চুরি হতেই দিইনি," বললেন দীপকাকু।

চায়ে সবে চুমুক দিয়েছিলেন বাবা, বিষম খেলেন। ঝিনুক আক্ষরিক অর্থে হাঁ হয়ে গিয়েছে। মাথায় চাপড় মেরে নিজেকে সামলালেন বাবা। তারপর বললেন, "ভেঙে বলো, ভেঙে বলো।"

ঠোঁট থেকে চায়ের কাপ নামিয়ে দীপকাকু বললেন, "বীণাপাণিদেবীকে আমি আগেই সতর্ক করে বলেছিলাম, আপনার ওই জিনিসগুলো চুরির চেষ্টা হচ্ছে। অম্বিকাচরণের কৃতিত্বের স্মারকগুলো সুটকেসে পুরে নিজের ঘরের আলমারির ভিতর নম্বর লকিং চেস্টের মধ্যে রাখতেন বীণাপাণিদেবী। নম্বরটা কাউকে বলেননি। আমি ওঁকে জানাই, মণিময়ের মতো দেখতে একজনকে রাস্তাঘাটে দেখা যাচ্ছে। সে সম্ভবত মণিময়ের পরিচয় নিয়ে যে-কোনও ছুতোয় সুটকেসটা বার করতে বলবে আপনাকে। আপনি সুটকেসের জিনিসপত্র সরিয়ে রেখে বাজে কাগজপত্র ভরে রাখুন। লোকটা যখন আপনার কাছে চাইবে, দিয়ে দেবেন। ভিতরের জিনিস পরখ করার জন্য লোকটা সুটকেসের চাবি দিতে বলবে। চাবি খুঁজে না পাওয়ার ভান করবেন আপনি। লোকটা সময় নষ্ট না করে ব্যাগসুদ্ধ পালাবে। কোনও ভাবেই বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না, আপনার বয়স হয়েছে, লোকটা আঘাত করতে পারে। যেমনটি বলেছিলাম, বীণাপাণিদেবী বাধ্য ছাত্রীর মতো সব কথা শুনেছেন।"

"চুরিটা তার মানে অফিসঘরে হয়নি, দোতলায় বীণাপাণিদেবীর ঘরে হয়েছে। তা হলে অফিসঘরের তালা ভাঙা হল কেন?" জানতে চাইল ঝিনুক।

দীপকাকু বললেন, "এই একটা জায়গায়ই লোকটা আমাকে টেক্কা দিয়েছে। ট্যাক্সি থেকে নেমেছে, দরোয়ান ওকে আটকায়নি, মণিময় ভেবে ছেড়ে দিয়েছে। লোকটা প্রথমেই দোতলায় যায়নি। লোহার শিক দিয়ে অফিসঘরের পলকা তালাটা ভেঙেছে। জানত, খানিক পরেই অফিসঘর খোলা হবে। তালা ভাঙা দেখে শুরু হবে চেঁচামেচি। তার আগেই সে পৌঁছে যাবে বীণাপাণিদেবীর ঘরে। সুটকেস বের করবেন বীণাপাণি। নিচ থেকে খবর যাবে অফিসঘরের তালা ভাঙা হয়েছে। উদ্বিগ্ন বীণাপাণিদেবী সব ভুলে ঘটনাস্থলে যাবেন, সেই ফাঁকে সুটকেস নিয়ে পালাবে লোকটা। সাকসেসফুল হয়েছে তার প্ল্যান। চোরটা কিন্তু ধরা পড়ত, ঝিনুক যদি ঠিকঠাক লক্ষ রেখে আমায় জানাত, কে ঢুকেছে অমল আলোয়। ধরা অবশ্য হত লোকটার পালানোর সময়। ঝিনুক তখন যে অফিসঘরে।"

অকারণে দোষ ঘাড়ে চাপছে দেখে ঝিনুক প্রতিবাদ করে, "গোটা ব্যাপারটা আমাকে আগে থেকে জানিয়ে রাখলে, গাড়ির কাছ থেকে নড়তাম না। লোকটা বেরোলেই ধরতাম।"

"নড়তেই তুমি। এমন এক্সাইটেড থাকতে, ট্যাক্সি থেকে নামা লোকটাকে দেখতে না পেয়ে ঢুকে পড়তে বাড়িতে। তোমাকে দেখতে পেলেই সেদিনের মতো চুরির প্ল্যান বাতিল করত অপরাধী," বললেন দীপকাকু।

বাবা জানতে চাইলেন, "সেদিনই যে চুরি হবে, তুমি বুঝলে কী করে?"

"সকালবেলা বীণাপাণিদেবী আমায় ফোন করে জানালেন, গতসন্ধেয় মণিময় ফোন করে বলেছে, বইয়ের জন্য তোলা ফোটোগুলোতে কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম থেকে গিয়েছে, কাল সকাল দশটা নাগাদ ফোটোগ্রাফার নিয়ে আসবে সে। ফের ফোটো তোলা হবে জিনিসগুলোর, শুনে আমি বললাম, ফোনটা মণিময়ের ডুপ্লিকেটের। সে এলে আমি যেমনটা বলেছি, সেরকমই করবেন। ডুপ্লিকেট এসেছিল একা। বলেছিল, ফোটোগ্রাফার এখনই আসছে, জিনিসগুলো বের করুন। আমার কথামতো আলমারি থেকে সুটকেস বার করে, চাবি হারিয়ে ফেলার অ্যাকটিং করেন বীণাপাণিদেবী। তখনই অফিসঘরের ঘটনার খবরটা ফোন মারফত উপরে আসে। উনি জেনে-বুঝে সুটকেস রেখে নীচে চলে যান।"

থামলেন দীপকাকু। চায়ের কাপ তুলে শেষ চুমুক দিতে গিয়ে দ্যাখেন, আগেই ফুরিয়ে গিয়েছে।

বাবা বলে উঠলেন, "সবই তো বুঝলাম, কিন্তু তুমি নিজেই তো বলছ, যে জিনিসগুলো চুরি করার চেষ্টা হয়েছে, আর্থিক মূল্য তেমন কিছু নয়। তা হলে এত প্ল্যান খাটিয়ে চুরি করতে গেল কেন চোর?"

জানলার কাছে গিয়ে সিগারেট টানতে-টানতে দীপকাকু বললেন, "কেসের মজাটা এখানেই। গোড়া থেকেই বলি, তদন্তের ভার হাতে আসার সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পারি, অপরাধ এমন কোনও জায়গায় ঘটতে চলেছে, যেখানে মণিময়ের অনায়াস যাতায়াত। মণিময়কে ফাঁসানো অথবা মণিময় ছাড়া অপরাধটা ঘটানো সম্ভব নয় বলেই ডুপ্লিকেটের আবির্ভাব। লক্ষ করি লোকটা মণিময়দের পাড়াতেই ঘুরপাক খাচ্ছে, ঢুঁ মারছে মণিময়দের বাড়িতে। মণিময়ের অন্য সার্কেলে, মানে অফিস, ডিলার, বন্ধুমহলে তার উপস্থিতি টের পায়নি কেউ। তা হলে কি মণিময়দের বাড়িতেই আছে কোনও মহার্ঘ্য বস্তু অথবা মূল্যবান কিছুর ঠিকানা? ওদের থেকে যা জানা গেল, কোনও রাজা-মহারাজার সঙ্গে ওদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। পূর্বপুরুষরা ছিলেন সাধারণ মানুষ। পল্লব ঘোষের কাছে আমি গিয়েছিলাম দু'টো কারণে, পল্লব ঘোষ ডুপ্লিকেট ব্যবহার করে মণিময়ের ক্ষতি চাইছে কিনা জানতে, মণিময় মানুষটা নিজে কেমন, সেটা বুঝতে। সন্দেহ করার মতো কিছু পাইনি। এর পর আমি ঠিক করি মণিময়ের যেখানে-যেখানে অবাধ গতিবিধি, সেই জায়গাগুলো একবার ভিজিট করব। ওঁর অফিস, ডিলার সার্কেলটা বাদ রাখি, ওখানে মণিময়কে অপদস্থ করার ইচ্ছে থাকলে ডুপ্লিকেট আগেই করত। এতদিন অপেক্ষা করত না। লোকটা কিছু একটা খুঁজছে।"

কথা কেটে ঝিনুক বলে ওঠে, "মণিময়দার সালকিয়ার বাড়িতেও ঢুঁ মেরেছিল একজন ফ্রেঞ্চকাট। ডুপ্লিকেটই ভেক ধরে গিয়েছিল, নাকি যে ডুপ্লিকেটকে নিয়োগ করেছে সে?"

"দু'জনের মধ্যে কেউ একজন তো বটেই," বললেন বাবা।

সিগারেট ফেলে দীপকাকু ফিরে এলেন সোফায়। ফের বলতে শুরু করলেন, "আমার ক্লায়েন্ট আর্কিওলজিস্ট ডক্টর সমরেশ রায়ের সঙ্গে আলোচনায় বসলাম। জানতে চাইলাম, সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়িতে এমন কী-কী জিনিস থাকতে পারে, যা মহামূল্যবান অথচ পরিবারের লোক জানে না। ডক্টর রায় বললেন, অনেক কিছুই হতে পারে, মাটির তলা থেকে পাওয়া কোনও প্রত্নসামগ্রী, পুরাকীর্তি, প্রাচীন মূর্তি, মুদ্রা, রেয়ার ডাকটিকিট। হতেই পারে বাড়ির লোক এর ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে অবহিত নয়। ডক্টর রায়ের কথা শুনে সুনেত্রাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। মণিময় এবং ওঁর ফ্যামিলির কারও কাছে প্রাচীন কোনও জিনিস আছে কিনা? সুনেত্রা সেরকম কিছুর সন্ধান দিতে পারলেন না। এর পর আমি ঠিক করি বীণাপাণিদেবীর কাছে যাব। ওঁর প্রতিষ্ঠানের

মহৎ কাজ আমায় টেনেছিল। দ্বিতীয় কারণ, ওখানে মণিময়দের অবাধ যাতায়াত। রাজামহারাজা না হলেও এই প্রথম কেসটার সঙ্গে জমিদারের সম্পর্ক দেখতে পাই। জমিদারের পুরস্কার ছাড়াও অম্বিকাচরণ মানুষটি জীবনে অনেক বড়-বড় লোকের সঙ্গে ওঠাবসা করেছেন। বীণাপাণিদেবীর বাড়িতে মহার্ঘ্য কিছু থাকলেও, থাকতে পারে বলে অনুমান করি।

"আবার ডক্টর রায়ের সঙ্গে বসলাম আলোচনায়। বীণাপাণিদেবীর বাবা এবং জমিদরের সম্বন্ধে সব শুনে ডক্টর রায় বললেন, 'দেখুন ওটা হয়তো সোনার মেডেল নয়, স্বর্ণমুদ্রা। জমিদারদের বেশির ভাগ ভীষণ হুইমজিক্যাল ছিলেন। সোনার মেডেল তৈরি করে রাখার মতো অর্গানাইজড স্বভাব তাঁদের ছিল না। কারও উপর খুশি হলেন, হাতের কাছে থাকা মোহর তুলে দিলেন উপহার হিসেবে। সেই মোহর বা স্বর্ণমুদ্রার ঐতিহাসিক মূল্য হয়তো এখন অনেক। হতে পারে দুষ্প্রাপ্য।'"

ছোট্ট পজ নিয়ে ফের দীপকাকু শুরু করলেন, "ডক্টর রায়ের অনুমান মিলে গেল। জগমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী পড়তে গিয়ে জানলাম, উনি ছিলেন মুদ্রা সংগ্রাহক। বিশেষ করে মোহরের উপর ঝোঁক ছিল খুব। পৃথিবীর নানা দেশে তখন মোহর তৈরি করার হিড়িক পড়েছে। ভারতে আগেই ছিল। স্বর্ণমুদ্রা হচ্ছে রাজামহারাজার শৌর্যের প্রতীক। এবার নবকৃষ্ণর জীবনী থেকে জানতে পারি, মুদ্রা সংগ্রহে তাঁর কোনও আগ্রহ ছিল না। অম্বিকাচরণ করকে তিনি বাবার সংগ্রহ থেকে মোহরই দিয়েছিলেন। সোনার মেডেল দেননি। আরও বিশদে জানতে আমি রাধিকাপুর লাইব্রেরিতে গেলাম। সেখানকার একটা বই থেকে পেলাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, জগমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সংগ্রহে ছিল নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির তৈরি করা প্রথম স্বর্ণমুদ্রা। দ্বিতীয় শাহ্ আলমের নামে করা হয়েছিল সেটা। পরে কোম্পানি নিজেদের নামে করে। এরকম অনেক মুদ্রা জগমোহনের উত্তরপুরুষের মাধ্যমে এখন সরকারি মিউজিয়ামে স্থান পেয়েছে। জগমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নিজের হাতে করা মুদ্রার লিস্ট থেকে কয়েকটা মিসিং। যার মধ্যে একটা নরওয়ের ১৮৭৪ সালের। ওদেশের একদম প্রথম দিককার ক্রেনার। মুদ্রাকেই এই নামেই ডাকে ওরা। আমার মনে পড়ে যায় বীণাপাণিদেবীর সেই কথাটা, জমিদার নবকৃষ্ণ অম্বিকাচরণকে বলেছিলেন, 'তুমি আমার গ্রামের সেই সূর্য, যে রাতেও অস্ত যায় না। তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেব।' যেটা দিয়েছিলেন, লোকে ভাবল মেডেল। আসলে ওটা নবকৃষ্ণর পিতা জগমোহনের সংগৃহীত নরওয়ের স্বর্ণমুদ্রা। স্কুলবেলায়ই আমরা জেনেছি, নরওয়ে নিশীথ সূর্যের দেশ। সেই দেশের যত উত্তরে যাওয়া যাবে, রাতের আকাশে বছরের প্রায় ছ' মাস পর্যন্ত দেখা যাবে সূর্যকে। দিগন্তে একফালি সূর্য," থামলেন দীপকাকু। ঝিনুকের খেয়াল পড়ে সে অনেকক্ষণ ধরে শ্বাস বন্ধ করে বসে আছে। এই কেসটা যে এরকম একটা পর্যায় পৌঁছে যাবে, ভাবতেই পারেনি। শ্বাস ছাড়ে ঝিনুক।

বাবা জানতে চান, "তারপর?"

দীপকাকু বলতে শুরু করলেন, "তারপর আর কী, বীণাপাণিদেবীকে নিজের আসল পরিচয় দিয়ে সব কিছু বললাম। কে আমায় নিয়োগ করেছিল, কাকে ধরার চেষ্টা করছি, সব। বিদেশে থাকা ডক্টর রায়ের সঙ্গে বীণাপাণিদেবীর কথা বললাম। মুদ্রার ফোটো তুলে ই-মেল করলাম ডক্টর রায়কে। উনি বললেন, মুদ্রাটি খুবই দুষ্প্রাপ্য। কালোবাজারে দশ, কুড়ি, তিরিশ লাখ ছাড়িয়ে যাবে। উনি চান, বীণাপাণিদেবী যেন সরকারি মিউজিয়ামে ওটা দান করেন। সেখানে অম্বিকাচরণের ইতিহাসও নথিভুক্ত থাকবে। কিছুদিন পরেই ডক্টর রায় দেশে আসছেন। তখনই স্বচক্ষে মুদ্রাটা দেখবেন। ডিটেলে কথা বলবেন বীণাপাণিদেবীর সঙ্গে। ততদিন যেন মুদ্রাটা সুরক্ষিত থাকে," দম নিতে থামলেন দীপকাকু। ফের বললেন, "সুরক্ষার ব্যবস্থা তো আমি করেই দিয়েছি। একই সঙ্গে বলেছি, এই অধ্যায়টা মণিময়দেরও না বলতে। মেডেলটা যে এত মহার্ঘ্য, বেশি লোকের না জানাই ভাল। খামোকা কৌতূহল বাড়িয়ে লাভ কী? আপনার অন্যান্য কাজ পণ্ড হবে।"

বাবার কৌতূহল কিন্তু মিটল না। দীপকাকু থামতেই জিজ্ঞেস করলেন, "জিনিসটার মূল্য বুঝতে তোমাকে অনেক ক'টা স্টেপ পেরোতে হয়েছে। চোর কীভাবে জানল মুদ্রাটা এত দামি?'"

"আমার মনে হয় মণিময় ফোটোগ্রাফারকে দিয়ে ফোটো তোলানোর পরই লিক হয়ে গিয়েছে ব্যাপারটা। মুদ্রার ফোটো কম্পিউটারে দেখা হয়েছে, পেজ মেকআপ হয়েছে, হয়তো ছাপাও হয়ে গিয়েছে বই। কোনও দুষ্কৃতীর চোখে পড়েছে ফোটোটা, কপি করে নিয়ে মুদ্রার কালোবাজারে নিয়ে গিয়ে জানতে পেরেছে দাম।"

দীপকাকুর কথার পর খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন বাবা। ফের বললেন, "এত যে খাটলে, তোমাকে পারিশ্রমিক দেবে কে? বীণাপাণিদেবীর কাছে চাইতে পারবে না। প্রথমত, তিনি তোমাকে নিয়োগ করেননি। তা ছাড়া সংস্থা চালাতেই অর্থের ঘাটতি পড়ছে তাঁর, মানবিকতার গ্রাউন্ডে তুমি কিছু বলতেও পারবে না। কাজটাও ইনকমপ্লিট থেকে গেল, অপরাধীকে ধরতে পারনি তুমি।"

উত্তরে দীপকাকু গম্ভীর ভাবে বললেন, "কাজ আমি অসম্পূর্ণ রাখি না রজতদা। পারিশ্রমিকও পাব, অপরাধীও ধরা পড়বে।"

॥ ১০ ॥

দু'দিনও কাটেনি। সকাল ন'টা নাগাদ দীপকাকু বাবাকে ফোন করে বললেন, "ঝিনুককে নিয়ে আমার বাড়িতে চলে আসুন তাড়াতাড়ি। মণিময়দের কেসের লাস্ট এপিসোডটা দেখে যান।"

অর্থাৎ আজ অপরাধী ধরা পড়বে, দীপকাকু পারিশ্রমিক পাবেন। ঝিনুকদের গাড়ি পৌঁছে গিয়েছে পিরপুকুরে, দীপকাকুর বাড়ির সামনে। আশুদা চালিয়ে নিয়ে এসেছে গাড়ি। দীপকাকু থাকেন দোতলায়। রাস্তা থেকে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে উপরে। এরকম খুব কমই আছে কলকাতায়। বাবার পিছন-পিছন সিঁড়ি ভাঙছে ঝিনুক। চাতালে উঠে ঝিনুকের চোখ আটকায় দরজার গোড়ায় রাখা একজোড়া চটির উপর। কেউ গিয়েছে ভিতরে। কে হতে পারে? বাবা পরদা সরিয়ে ঢুকলেন ঘরে। তারপর ঝিনুক। দু'জনেই থমকে দাঁড়ায়, দীপকাকুর টেবিলের সামনে থেকে উঠে আসছে ডুপ্লিকেট। পরনে সেই টি শার্ট, যাদবপুর মলে এটাই ছিল লোকটার গায়ে। কথা বলছিল পল্লব ঘোষের সঙ্গে।

এই মুহূর্তে বাবাকে যখন ক্রস করছে ডুপ্লিকেট, বাবা সৌজন্যের হাসিসহ বললেন, "ভাল তো?"

কোনও উত্তর না দিয়ে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেল লোকটা। বাবা ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ কী রে, চিনতেই পারল না।"

লোকটাকে মণিময়দা ভেবেছেন বাবা, ঝিনুক বলল, "এটা ডুপ্লিকেট।"

"সর্বনাশ কাণ্ড। এ তো একেবারে যমজ!" বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন বাবা। তফাত অবশ্য ঝিনুকের চোখে পড়েছে, মণিময়দার চেয়ে রোগা, গোঁফ মোটা, চশমা নেই, চুল উলটে আঁচড়ানো।

দীপকাকুর টেবিলটা নতুন। বসে আছেন ওপারের চেয়ারে। ঝিনুকরা বসে এপারের দু'টোয়। আগে এত চেয়ারও ছিল না। দীপকাকুর পিছনের দেওয়ালে আদি অকৃত্রিম সেই ব্ল্যাকবোর্ড। বাবার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন দীপকাকু। মোটা কাচের চশমার ভিতর থেকে চোখের মণি দুটো স্থির হয় টেবিলে রাখা খামের দিকে। টাকার বানডিল আছে বলে আন্দাজ করা যায়। দীপকাকু বললেন, "পারিশ্রমিক।"

"তার মানে অপরাধীই পারিশ্রমিক দিয়ে গেল! তুমি ওকে ধরলে না কেন?" জিজ্ঞেস করলেন বাবা।

"অনেক করে ক্ষমা চাইল। লিখিত ডিক্লারেশন দিল, আর কখনও এরকম করবে না। ক্ষতি তো কিছু করতে পারেনি, ছেড়ে দিলাম।"

দীপকাকুর উদারতায় খুশি হতে পারলেন না বাবা। বললেন, "এটা তুমি ভাল করোনি। লোকটার শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল। কোথায় থাকে কী করে, সব ঠিকঠাক বুঝে নিয়েছ তো?"

বাবার কথা শেষ হতেই ঝিনুকের মাথায় ফ্ল্যাশের ঝলকানির মতো একটা স্মৃতি ফিরে এল। উত্তেজিত কণ্ঠে ঝিনুক বলে ওঠে, "লোকটাকে আমি চিনেছি, মণিময়দা।"

"সে কী রে!" বলে বাবা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ঝিনুকের দিকে তাকালেন।

দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "কী করে বুঝছ?"

ঝিনুক বলল, "চটি। দরজার বাইরে যে ব্র্যান্ড নিউ চটিটা ছিল, কোম্পানির স্টিকার পর্যন্ত ওঠেনি, আট নম্বর সাইজ, ওটাই আমি দেখেছি সুনেত্রাদির বাড়িতে ইনভেস্টিগেট করতে গিয়ে। খবরের কাগজের বানডিলের সঙ্গে শু র‍্যাক থেকে কয়েকটা চটিজুতোও পড়ে গিয়েছিল। সুনেত্রাদি এটা তুলে রাখতে গিয়েছিলেন, আমি মানা করি। বলি জিনিসগুলো যে পজিশানে আছে তেমনই থাক। সেদিন ওদের লন্ডভন্ড ফ্লোরের সব ফোটোই তুলেছি, চটির ফোটোটাও নিশ্চয়ই আছে। তবে মোবাইল ফোনে তোলা তো, জানি না কেমন হয়েছে।"

বাবা এবার দীপকাকুর দিকে তাকালেন। জানতে চাইলেন, "কী গো, ঠিক বলছে?"

মাথা উপর-নীচ করে সম্মতি জানালেন দীপকাকু। তারপর বলতে শুরু করলেন, "ঝিনুক প্রথম যেদিন কেসটার কথা আমায় বলল, তখন থেকেই অল্প হলেও মণিময়ের উপর সন্দেহ ছিল আমার। ডিটেকটিভকে কেসটা দিতে চেয়েছিল সুনেত্রা, ঝিনুকের পরিচয় জেনে এই ভাবনা মাথায় এসেছিল তার। মণিময় কপট আগ্রহ দেখায়। তারপর ক্রমান্বয়ে সে চেষ্টা চালিয়েছে, কেসটা থেকে আমাদের সরিয়ে দেওয়ার। বারবার কনফিউজ করেছে আমাদের। ওদের বাড়িতে প্রথম দিন গিয়ে দেখি, মণিময় ফোনে খুব ব্যস্ত। কথায় কান রাখলাম, বুঝতে পারছিলাম বেশ কিছু ফোনে মিথ্যে-মিথ্যে কথা বলছে। সেট করে রেখেছিল রিং অ্যালার্ম। কিছুক্ষণ অন্তর ফোন বাজছিল। একবার সে চা করে নিয়ে আসে। ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দোকানে গিয়ে আমরা জানতে পারি, ডুপ্লিকেট টাকা মিটিয়ে দিয়ে গিয়েছে। তখনই আমাদের মনে হয় অ্যালিবাই খাড়া করার চেষ্টা হচ্ছে। পরে যেদিন ওদের বাড়ি যাই, টয়লেট যাওয়ার ছুতো করে দেখে আসি, পিছনের দরজাটা। বাড়ি থেকে বেরনোর পর পার্কে লোক হাঁটাহাঁটি করতে দেখে খেয়াল করি, মণিময়দের পিছনের দরজাটা সরাসরি দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ ভিতরে মোবাইলে কথা বলার অ্যাকটিং করতে-করতে ছদ্মবেশ নিচ্ছিল। মেকআপটা খুব সহজ। গোঁফের উপর আইব্রো পেনসিল, চশমা খুলে ফেলা, পাজামা-পাতলুন পরা। চা বানানোর সময়টায় পিছনের দরজা দিয়ে এসে দোকানের টাকা শোধ করে যায়। তখন সন্ধে, অন্ধকারে কাজটা করতে অসুবিধে হয়নি তার। ডুপ্লিকেট সেজে সুনেত্রার স্কুল বেরনোর সময় বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকাও ছিল অ্যালিবাই রাখার প্ল্যান। হিসেবমতো মণিময় আগের দিনই ধানবাদ গিয়েছে অফিস টুরে। ধানবাদের হোটেলের নম্বর নিয়েছিলাম সুনেত্রার থেকে, ফোন করে জেনে নিই কোন সময় মণিময় ঢুকেছে হোটেলে। টাইমটার সঙ্গে হাওড়া থেকে যাওয়া ট্রেনের পৌঁছনোর সময়ের সঙ্গে মিলে যায়। যদিও আগের দিনও প্যারাডাইস হোটেলেই ছিল সে। মাঝে সুনেত্রাকে ভয় দেখিয়ে গিয়েছে। সুনেত্রার ফোন মণিময় তখন ধরেনি, কারণ ট্রেনে ছিল। ফোনের ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড শুনে সুনেত্রা জিজ্ঞেস করতে পারে, 'এখন ট্রেনে কেন?' প্রশ্নটা এড়াতে চেয়েছে মণিময়। যত মিথ্যে বলবে, প্রমাণ করার দায় থাকবে। জড়িয়ে পড়বে আরও অনেক মিথ্যেয়।"

বাবা বলে ওঠেন, "এত কাণ্ড মণিময় করতে গেল কেন? বীণাপাণিদেবীর সঙ্গে সুনেত্রার যা রিলেশন, সুনেত্রা চাইলে হয়তো উনি মেডেলটা দিয়েই দিতেন।"

"হয়তো দিত। কিন্তু সুনেত্রা ওটা বিক্রি করতে দিত না। লেখাপড়াটাকে সে উঁচুতে স্থান দেয়। বংশের গৌরব অম্বিকাচরণের প্রতি সেও শ্রদ্ধাশীল। চুরি করা ছাড়া মণিময়ের আর কোনও রাস্তা ছিল না। চুরি সহজে করা যাবে, দায় চাপানো যাবে অন্যের ঘাড়ে, ভেবেই ডুপ্লিকেটের পরিকল্পনাটা নেয় সে," থামলেন দীপকাকু। একটু বিরতি নিয়ে ফের বললেন, "মণিময় প্রথমে বলেছিল না, বাজারওলা, পাড়ার লোক ডুপ্লিকেটকে দেখে তার সঙ্গে গুলোচ্ছে। ওসব বাজে কথা। সুনেত্রার সামনে ডুপ্লিকেটকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল ওর আসল উদ্দেশ্য। ডুপ্লিকেটের সাক্ষী বলতে, দোকানদার, সুনেত্রা, ইলেকট্রিশিয়ান, যে বাড়িতে এসেছিল এবং ঘটনার দুর্বিপাকে আমরা।"

"ওর দোষ প্রমাণ করার মতো এভিডেন্স তোমার হাতে আছে?" জানতে চাইলেন বাবা।

দীপকাকু জোরের সঙ্গে বললেন, "অবশ্যই। নয়তো মণিময় বাড়ি এসে টাকা দিয়ে যাবে কেন? ওর অস্ত্রেই ওকে ঘায়েল করেছি। কবে টুরে যাচ্ছে, ওর অফিস থেকে জেনে নিলাম। পল্লব ঘোষকে দিয়ে ফোন করালাম মণিময়কে। আমি যেমন শিখিয়ে দিয়েছিলাম পল্লব তাই বলল, 'তোর সঙ্গে দেখা করতে চাই। দীপঙ্কর বাগচী নামে এক ডিটেকটিভ তোর সম্বন্ধে জানতে এসেছিল আমার কাছে।' মণিময় বলেছিল, 'কী জানতে চাইল সে?' পল্লব বলে, 'ফোনে বলা যাবে না। ডিটেকটিভের সঙ্গে একটা পুলিশ অফিসারও এসেছিল। ফোন ট্যাপ হতে পারে।' মণিময়ের একটু সন্দেহ হয়। জিজ্ঞেস করে, 'তুই আমাকে সাহায্য করতে চাইছিস কেন? হিসেবমতো আমি তো তোর শত্রু।' আমার শেখানো কথাই বলেছিল পল্লব ঘোষ, 'আমি সেসব ভুলে গিয়েছি। আমার অবস্থা এখন খুব খারাপ। বউয়ের অসুখ আরও বেড়েছে, কোথাও একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দে।' ফাঁদে পা দিল মণিময়। দুর্গাপুরের ট্রেন না ধরে চলে এল শপিং মলে। আমার কথামতো ওখানেই মিট করতে বলেছিল পল্লব। আমার নির্দেশে হাতে একগাদা সস মাখানো বার্গার নিয়ে সুদর্শনদা মলের গেটে দাঁড়িয়ে ছিল। মণিময় ঢুকতেই হোঁচটের ভান করে, তার গায়ে পড়ে শার্টের ভাল করে টম্যাটো সস মাখিয়ে দেয়। তখনই একটা শার্ট কিনতে বাধ্য হয় সে। পল্লব এসে তাকে সামান্য প্ররোচনাও দেয়, 'ইস, কী অবস্থা! এক্ষুনি একটা শার্ট কেন। এত বড় পোস্টে চাকরি করিস, চেনাজানা লোক দেখে ফেললে, কী বলবে!'

"ইতিমধ্যে আমি ঝিনুক, সুনেত্রাকে হাজির করে ফেলেছি শপিং মলে। অচেনা টি শার্টের কারণে মণিময়কে ডুপ্লিকেট বলেই ধরে নেয় সুনেত্রা, এমনকী, ঝিনুকও। স্বাভাবিক নিয়মে ডুপ্লিকেটকে দেখতে যাচ্ছে জানিয়ে সুনেত্রা ফোন করেছিল মণিময়কে। সত্যিটা চেপে গিয়েছে মণিময়। তখনও সে জানে না, ডিটেকটিভ তার সম্ভাব্য অপরাধের ব্যাপারে কতটা জেনেছে। পল্লব তাকে বিশেষ কিছুই বলেনি। মণিময় সম্বন্ধে আমি যা-যা জিজ্ঞেস করি, সেগুলোই বলতে বলেছিলাম। চেয়েছিলাম কেসের আসল গল্পটা পল্লবের কাছেও অজানা থাকুক। মল থেকে বেরিয়ে সুনেত্রা আবার ফোন করে মণিময়কে সমস্ত ঘটনা জানায়। মণিময়ের সত্যিটা তখন আর স্বীকার করার উপায় নেই। খানিক আগেই জানিয়েছে, দুর্গাপুরে আছে সে। তা ছাড়া ডুপ্লিকেটকে প্রতিষ্ঠা করার পড়ে পাওয়া সুযোগ ছাড়বে কেন? পল্লব মণিময়ের সঙ্গে সমস্ত কথোপকথন মোবাইল ফোনে রেকর্ড করেছে আমার নির্দেশে। সেটা শুনিয়েই আমি মণিময়ের থেকে পারিশ্রমিক আদায় করলাম। ওর কুকীর্তির প্রমাণ এখন আমার হাতের মুঠোয়।"

ঝিনুক এখন মেলাতে পারছে মণিময়দা যেদিন কেন খারাপ বিহেভ করে গেলেন দীপকাকুর অফিসে এসে। কেন সুদর্শনদাকে দেরিতে আসতে বলেছিলেন দীপকাকু। সুদর্শনদাকে দেখলেই মণিময়দার প্রশ্ন জাগত, শার্টে সস মাখিয়ে দেওয়া লোকটা এখানে কী করছে?

এই মুহূর্তে ঝিনুকের একটা দরকারি কথা মনে পড়ে যায়। দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করে, "মণিময়দার সালকিয়ার বাড়িতে ঢুঁ মারা ফ্রেঞ্চকাট লোকটি তা হলে কে? কেসটায় মণিময়দা তো নিজেকেই নিজে নিয়োগ করেছেন।"

"ওটা আমি! ছদ্মবেশ নিতেই হয়েছিল। মণিময়ের বাড়ির লোক আমার চেহারার বর্ণনা মণিময়কে জানালে, ধরে ফেলত, কে গিয়েছিল," বললেন দীপকাকু।

বাবা জানতে চাইলেন, "কেন গিয়েছিলে?"

"বীণাপাণিদেবীর পাণ্ডুলিপিটা খুঁজতে। আর একটা ব্যাপারও বুঝতে গিয়েছিলাম, মণিময়ের অতীত। পল্লব ঠিকই বলেছিল। সত্যিই খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার। অনেক শেয়ারের বই দেখলাম মণিময়ের

র‍্যাকে। হঠাৎ বড়লোক হওয়ার ইচ্ছে। এ বাড়িতে বইগুলো আনতে পারেনি। সুনেত্রা সম্ভবত পছন্দ করে না।"

দীপকাকু থামতেই বাবা বলে উঠলেন, "আমি কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না, মণিময়ের কেন শাস্তির ব্যবস্থা করলে না তুমি। শুধু টাকা নিয়ে ছেড়ে দিলে? যথেষ্ট গর্হিত অপরাধ করেছে সে।"

উত্তরে দীপকাকু বললেন, "মানছি। তবে ওকে শুধরে যাওয়ার একটা সুযোগ দিলাম। মারাত্মক অপরাধপ্রবণ ছেলে সে নয়। মোহরটা হাতানোর আরও অনেক পন্থা ছিল। লুকিয়ে এ বাড়িতে ঢুকে মুখোশ পরে বন্দুক ধরতে পারত বীণাপাণিদেবীর কপালে। কণ্ঠস্বর নকল করে বলত, 'জিনিসটা বের করে দিন।' নিজে বের করতে পারবে না। নম্বর লকিং চেস্টে থাকত জিনিসগুলো। সংখ্যাগুলো তার জানা নেই। কথা না শুনলে বীণাপাণিদেবীকে আঘাত করতেই হত, মারাও যেতে পারতেন উনি। মণিময় সেই রাস্তায় যায়নি। কারণ, সে জানে, বীণাপাণিদেবী সুনেত্রার আইডল। কষ্ট দিতে চায়নি সুনেত্রাকে। এতেই বোঝা যায়, স্ত্রীকে সে কতটা আপন মনে করে। সুখে ঘরসংসার করতে চায় মণিময়। চুরির সময় আমি বীণাপাণিদেবীর পাশের ঘরে ছিলাম। ফোটোগ্রাফার নিয়ে মণিময় আসছে জেনে চলে আসি। আড়াল থেকে লক্ষ করেছিলাম ওর কর্মপদ্ধতি। যদি বেগড়বাঁই কিছু করত, সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। আমার হাত থেকে পালালেই ফোন করতাম ঝিনুককে, ধরা ও পড়তই।"

একটু পজ নিয়ে দীপকাকু বললেন, "এখানে একটা ইনফরমেশন অ্যাড করি। সেদিন কিন্তু মণিময় ডুপ্লিকেট সাজেনি। কারণ, দরোয়ান এবং বীণাপাণিদেবীর যাতে কোনও খটকা না লাগে। সব দেখে বুঝে আমার মনে হয়েছে মণিময়ের একটা সুযোগ প্রাপ্য। খুনজখমের রাস্তায় যাবে না বলেই এত নিপুণ ভাবে প্ল্যানটা সাজিয়ে ছিল। ওর নিপুণতার আর একটা নমুনা দিই, চুরির দিন দারুণ একটা অ্যালিবাই রেডি করেছিল। ইচ্ছে করেই ল্যাপটপ ফেলে যায় বাড়িতে। সুনেত্রা সেটা পৌঁছে দিতে গিয়ে সাক্ষী থাকে মণিময়ের দুর্গাপুরে যাওয়ার। ট্রেনটার পরের স্টপ বর্ধমান। প্রায় দু' ঘণ্টা। যে সময়ের মধ্যে চুরির ঘটনা ঘটে যাবে। আমি শিওর, ট্রেন হাওড়ার প্ল্যাটফর্ম ছাড়ার আগেই উলটো দরজা দিয়ে নেমে পড়েছিল মণিময়। চুরির পর ওকে অভিযুক্ত করতে পুলিশেরও বেশ বেগ পেতে হত। মণিময় সত্যিই আমাকে লিখিত ডিক্লারেশন দিয়েছে, আর কোনও দিন অপরাধমূলক কাজ করবে না। শপথ নিয়েছে আসলে নিজের কাছেই। আমাকে লিখে দিয়ে নিজের লোভী মনটাকে বরাবরের জন্য বেঁধে ফেলল। এতেই প্রমাণ হয় সহজ, সাধারণ জীবনটা যে সত্যিই কত সুন্দর, উপলব্ধি করেছে মণিময়।"

দীপকাকুর কথার মাঝে ডিসটার্ব করেনি ঝিনুক। একটা ব্যাপারে শিওর হয়ে নেওয়ার জন্য বলল, "শপিং মলের ঘটনার সময় আপনি বোধ হয় কাছাকাছিই ছিলেন, তাই না?"

মাথা নেড়ে সায় জানালেন দীপকাকু। আগের কথার রেশ থেকে এখনও বেরোতে পারেননি। বলতে থাকলেন, "ইন ফ্যাক্ট আমি চাইনি আপনারা মণিময়কে অপরাধী হিসেবে জানুন। আমি নিজেই ওকে বলেছিলাম, ডুপ্লিকেটের মেক আপ নিয়ে যেন পেমেন্ট দিতে আসে। বীণাপাণিদেবীও জানেন না মণিময় অপরাধী। আমি আগে থেকেই আন্দাজ করে ওঁকে বলেছিলাম, অবিকল মণিময় সেজেই ডুপ্লিকেট আসবে। এত কিছুর পরও মণিময়কে লুকোতে পারলাম না। ঝিনুক ঠিক ধরে ফেলল। গোয়েন্দা হওয়ার মতো অবজারভেশন পাওয়ার ওর এসে গিয়েছে।"

এর পর দীপকাকু যা করলেন, উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ঝিনুক। টেবিলে রাখা খামে মোড়া টাকার বানডিলটা ঝিনুকের দিকে বাড়িয়ে বাবার উদ্দেশে বললেন, "আমার অনেক ক'টা কেসে ঝিনুক অ্যাসিস্ট করেছে। ওকে তেমন কিছু দেওয়া হয়নি। আজ ওর কৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ এই কেসের পুরো টাকাটাই তুলে দিলাম। ইচ্ছেমতো খরচ করুক।"

বাবা প্রায় হায়-হায় করে উঠলেন, "বাচ্চা মেয়ে এত টাকা নিয়ে কী করবে! যখন যা চাইছে, কিনে তো দেওয়া হচ্ছে।"

ঝিনুক কখন যেন টাকাভরা খামটা হাতে নিয়ে ফেলেছে, উঁকি মারছে একশোর নোট। অ্যামাউন্ট মন্দ হবে না।

বাবা এবার ঝিনুককে বলছেন, "কী রে, টাকা হাতে দাঁড়িয়ে রইলি যে! এত টাকা নিয়ে কী করবি?"

একটু সময় নিয়ে ঝিনুক বলল, "বীণাপাণিদেবীর প্রতিষ্ঠানে ডোনেট করব।"

বাবা, দীপকাকু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ঝিনুকের দিকে। ওঁদের চোখে ফুটে উঠেছে ঝিনুককে নিয়ে গর্বের আলো। এও তো এক ধরনের অমল আলো।